পল্লীকথা

পল্লীকথা

দীনেন্দ্রকুমার রায়

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
আগস্ট—১৯৬১

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

নিবেদন

বঙ্গীয় পল্লী-জীবনের যে সকল 'চিত্র' ইতিপূর্ব্বে কোন কোন মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরই কয়েকটি পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া 'পল্লী-কথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। বঙ্গদেশের বর্ষব্যাপী উৎসবের চিত্রগুলি বহুদিন পূর্ব্বে 'পল্লী-চিত্র' ও 'পল্লী-বৈচিত্র্য' নামক গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই দুইখানি পুস্তক সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়াছে। সেই দুইখানি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে যেরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, অল্পসংখ্যক বাঙ্গালা উপন্যাস সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকগণের নিকট সেরূপ আদর ও প্রশংসা লাভে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী কোনও উদারহৃদয় ধনাঢ্য ব্যক্তির আনুকুল্য ব্যতীত এই পুস্তক দুইখানির পুনর্মুদ্রণের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কাগজের মহার্ঘ্যতা ও আমাদের আর্থিক অসঙ্গতি এই গ্রন্থদ্বয়ের পুনঃপ্রকাশের প্রধান অন্তরায়,—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

'পল্লী-কথা' পল্লীচিত্র ও পল্লী-বৈচিত্র্যের ন্যায় বাঙ্গালীর উৎসব-চিত্র না হইলেও বোধ হয় ঐ শ্রেণীর গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইবার অযোগ্য নহে। কারণ, ইহাও পল্লী-জীবনের আলেখ্য। সাধারণ পল্লীবাসীগণের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, মিলন-বিরহ, ও বেদনা-বাসনার কয়েকটি চিত্র ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। জানিনা সাহিত্যরসজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর নিকট ইহা সমাদৃত হইবে কি না।

মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পল্লীবাসীগণের এই চরিত্র-চিত্রগুলির অধিকাংশই বাঙ্গালীর জাতীয় মহোৎসব দুর্গোৎসবের সকরুণ মধুর স্মৃতির সহিত অল্পাধিক পরিমাণে বিজড়িত বলিয়া, বর্ত্তমান মহাপূজা উপলক্ষে ইহা বঙ্গীয় পাঠকসমাজের হস্তে সাদরে অর্পিত হইল। যদি ইহা বঙ্গসাহিত্যে কিছুকালের জন্যও স্থায়িত্ব লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়, এবং সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী ইহা পাঠে বিন্দুমাত্র আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলেই 'পল্লীকথা' প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হইবে। আশা করি, পল্লী-জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নগরবাসী ও দেশ-দেশান্তরের প্রবাসী পাঠকমণ্ডলী 'পল্লী-কথা' পাঠ করিয়া চির-উপেক্ষিত বঙ্গ-পল্লীর সাধারণ

অধিবাসীগণের চরিত্রগত বিশেষত্ব ও সমাজগত আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।

আজকাল অনেক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের রচনায় পল্লীবাসীগণের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার ও বেদনা-বাসনা-ভ্রান্তির নানা উজ্জ্বল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহাদের রচিত পল্লীজীবনের সেই আখ্যায়িকাগুলি রচনাগুণে মনোমুগ্ধকর হইলেও, পাঠ করিয়া পল্লীবাসীগণের মনে হয় অনেকেরই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগুলি যেন খাঁটি পল্লীগ্রামের মানুষ নহে; তাহাদের সমাজ ঠিক পল্লীগ্রামের সমাজ নহে। যেন পল্লীবাসীর মুখোস পরিয়া কেহ গ্রামফোনের 'রেকর্ড' হইতে পল্লীবাসীব কণ্ঠস্বরের অনুকরণে একটা অস্বাভাবিক সুর বাহির করিতেছেন। পল্লীবাসীগণের সুখ-দুঃখ, বাসনা-বেদনা, মিলন-বিরহেব চিত্র অঙ্কিত করিতে যে পরিমাণ সহানুভূতির আবশ্যক, তাঁহাদের রচনায় তাহার অভাব নাই বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে দীর্ঘকাল বাস করিয়া, পল্লীবাসীগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া-মিশিয়া তাহাদেব রুচি-প্রবৃত্তি অভাব-অভিযোগ ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের প্রণালী প্রভৃতি অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাহাদের অনতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিবার সুযোগ তাঁহাদের সকলেরই আছে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান লেখকের লিপিকুশলতার অভাবে চিত্রগুলি হয় ত নিখুঁত হয় নাই, কিন্তু পল্লীজীবনের এই সকল কথা গ্রামফোনের রেকর্ডের 'বেসুরো' ধ্বনি বলিয়া সন্দেহ না হইতেও পারে। এই চিত্রগুলি খাঁটি পল্লী-সমাজের চিত্র ভিন্ন, কোনও সুনিপুণ চিত্রকরের কল্পনালোক-বিরাজিত-পল্লীবাসীগণেরও অনুমানসৃষ্ট সমাজ-জীবনের সুরঞ্জিত আলেখ্য নহে, পাঠকসমাজের এরূপ ধারণা হইলেই শ্রম সফল মনে করিব; কারণ, অঙ্কণ-কৌশলের সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এগুলি যাহাদের চিত্র, তাহারা দোষে গুণে বঙ্গ-পল্লীরই জীবন্ত মানুষ,—পল্লীগ্রামের প্রাণ এবং পল্লীসমাজের মেরুদণ্ড।

শারদীয়া ষষ্ঠী,১৩২৪ — শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

পল্লীকথা

প্রথম স্তবক

আগমনী

মামা প্রাণগোপাল সুভাষিণীকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসিতেন। সুভাষিণীর বয়স দশ বৎসর। সে বড় অভাগিনী। সাত বৎসর বয়সে সে মাতৃহীনা হয়, তাহার পর এই তিন বৎসর বলরামপুরে তাহাব মামার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। মাতামহী মাতৃহীনা দৌহিত্রীকে এক বৎসর পরম স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালিত করিয়া কৃতান্তের আহ্বানে পরলোকে প্রস্থান করিলে, সুভাষিণীর মুখের দিকে চাহে, এমন স্ত্রীলোক সংসারে কেহই রহিল না। কেবল মামা প্রাণগোপালই বিশ্বসংসারে তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিলেন।

সুভাষিণীর পিতা হরিশ চাটুয্যে মহা কুলীন ; তাঁহার পিতামহ গোকুল চাটুয্যে একশত আটটি এবং পিতা গোবৰ্দ্ধন চাটুয্যে পঁয়ষট্টিটি মাত্র কুলীনমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন ! হরিশ পিতার কুপুত্র, একটিমাত্র বিবাহ করিয়া তিনি কুলীনের নাম কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই ; এজন্য অনেক কুলীন-বৃদ্ধের নিকট তাঁহাকে বিস্তর গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই চাটুয্যে-বংশ চিরকাল মাতুলান্নে প্রতিপালিত। তাঁহাদের আদি নিবাস্ কোন্ জেলায়, এবং কোন্ গ্রামে, হরিশ তাহাও জানিতেন কি না সন্দেহ। উপবৃক্ষের মত তাঁহারা বংশানুক্রমে মাতুলের স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া আসিতেছেন। হরিশ এখন মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ; কয়েক বিঘা জোত জমি, তুঁতের ক্ষেত, আম-কাঁঠালের বাগান ও কয়েক ঘর শিষ্য, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক পত্নী বৰ্ত্তমানে হরিশকে কেহ বহুবিবাহে সম্মত করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সাধ্বী পত্নী হরিপ্রিয়া দেবী সাত বৎসরের শিশু কন্যা সুভাষিণীকে রাখিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলে, সাতান্ন বৎসর বয়সে হরিশের পত্নীশোক অসহনীয় হইয়া উঠিল। বৎসর ঘুরিতে-না-ঘুরিতে তিনি একটি কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিয়া

সেই শোক সম্বরণ করিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহাকে নূতন করিয়া কালা-পেড়ে ধুতি পরিতে ও মাথায় টেড়ী কাটিতে দেখা গেল! খবরের কাগজ হাতে পড়িলেই তিনি চোখে চশমা আঁটিয়া চুলের কলপের বিজ্ঞাপন খুঁজিতেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল পল্লীবাসী গ্রাম-সম্পর্কে তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত, এই দ্বিতীয় সংসারের আবির্ভাবের পর হইতে তাহারা তাঁহাকে 'দাদা' বলিলেই তিনি চটিয়া লাল হইতেন; এবং তাঁহার অপেক্ষা দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোনও লোক তাঁহাকে 'ভায়া' বলিয়া ডাকিলে তিনি তাহাকে তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়া চারি আনা সেরের 'অম্বুরী' তামাকে পরিতৃপ্ত করিতেন।—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার তামাক-খরচ দিন দিনই বাড়িয়া উঠিল! তখন অনেকেই বলিল, হরিশ মনুষ্যচর্ম্মাবৃত একটি গর্দ্দভ মাত্র!

কুলীনের মেয়ে পিতার স্কন্ধের ভারস্বরূপ। আজকাল হিন্দু গৃহস্থমাত্রেরই কন্যা পিতার জীবনের অভিশাপস্বরূপ। মেয়ে হইয়াছে শুনিলে গৃহে বিষাদের ছায়া পড়ে; পিতার মনে অনুতাপ উপস্থিত হয়, প্রসূতি আপনাকে মহা দুর্ভাগিনী মনে করেন। কিন্তু যে সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বদেবতার মঙ্গলময় ইচ্ছায় কন্যার জন্ম, তাঁহার সৃষ্ট মায়ার বন্ধনেই বালিকার জীবন-রক্ষা হয়। হরিশ সুভাষিণীকে গলগ্রহ মনে করিতেন, এবং সন্ধ্যার পর যখন তিনি ঘরের বারান্দায় একখানি অর্দ্ধছিন্ন 'মাদুরে'র উপর বসিয়া ময়লা বালিশে ঠেস দিয়া ডাবা হুঁকায় অম্বুরী তামাক টানিতেন, এবং আফিংয়ের মৌতাতে তাঁহার চক্ষু দু'টি নিমীলিত হইয়া আসিত, তখন তিনি কিরূপে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিতেন। কোন কোন দিন তাঁহার মনে হইত, বিধাতাপুরুষ বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন, স্ত্রীটিকে না লইয়া যদি তিনি কন্যাটিকে সরাইতেন, তাহা হইলেই বিচারটা ঠিক হইত।

কিছুদিনের মধ্যেই হরিশ বিধাতা-পুরুষের এই ভ্রম প্রকারান্তরে সংশোধিত করিলেন। তিনি সুভাষিণীকে তাহার মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। সুভাষিণীর মাতামহী জীবিতা ছিলেন; তিনি দৌহিত্রীটিকে ফেলিতে পারিলেন না। প্রাণগোপাল ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই বলিয়া প্রাণগোপালের স্ত্রী নয়নতারা একবেলা অনশনে ও তিন দিন ধরাসনে কালযাপন করিয়াছিলেন; সপ্তাহকাল স্বামীর সহিত বাক্যালাপবন্ধ ছিল। প্রাণগোপালের পক্ষে ইহা শাপে বর হইয়াছিল। দিবারাত্রি প্রেমময়ী ভার্য্যার বচনসুধা-পানে তাঁহার উদর এরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে, কয়েক দিনের রোমন্থন ভিন্ন তাহা জীর্ণ হইবার আশা ছিল না।

কিন্তু তথাপি তাঁহাকে সুভাষিণীর ভার লইতে হইল। তাঁহার মা ভাবিতেন, "পুত্র স্ত্রৈণ, দায়ে পড়িয়া ভাগিনীটিকে লইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু মুখে একটা

মিষ্ট কথা নাই !"—স্ত্রী ভাবিত, "মিন্‌সে মায়ের কেনা গোলাম, আমার উপর তার এক বিন্দু মায়া-মমতা নাই। নিজের ছেলে মেয়ের চেয়ে ভাগিনীর উপরেই বেশী দরদ !"—দেখিয়া শুনিয়া প্রাণগোপাল হাল ছাড়িয়া দিলেন ; মাতা ও স্ত্রী উভয়কেই যত দূর পারিতেন পরিহার করিয়া চলিতেন।

সুভাষিণী কিছুদিনের মধ্যেই মামার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল। প্রাণগোপালের কন্যা আহ্লাদীর মত দুষ্টু মেয়ে ভূমণ্ডলে বোধ হয় অল্পই আছে। দুষ্টুমি তাহার সহজাত-সংস্কারের মত। তাহাকে যাহা বলা হইত, সে তাহার উল্টা করিত ! আহ্লাদীর ব্যবহারে পাড়ার লোক জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অনুগ্রহে কাহারও টালে, শশা কি শিম থাকিত না ! মধু বেণে তাহার পিতার বয়সী, মশলার দোকান করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আহ্লাদী একদিন তাহার দোকানে গিয়া হাজির ! বলিল, "মধু দাদা, আমাকে একমুঠো ছোট এলাচ দাও।" মধু বলিল, "যা, পয়সা আন্‌গে ; বিনি-পয়সায় একমুঠো এলাচ খায় না !"—আহ্লাদী মধুকে উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নাচিতে নাচিতে বলিল—

"মোদো খায় খোদোর বিচি,
নীলমণি খায় ফ্যান,
মোদোর বাপের দাড়ি ধরে
নাচ্‌চে কোলা ব্যাঙ্ !"

মধু রাগিয়া আগুন !—মধুর স্ত্রীর সহিত আহ্লাদীর মার সে দিন স্নানের ঘাটে যেরূপ কলহ আরম্ভ হইল, কংগ্রেসের কলহও তাহার নিকট লজ্জা পায় !

একদিন দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী জমীদার-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণগোপাল বলিলেন, "আহ্লাদী, এক গেলাস জল আন্‌তো মা !"

আহ্লাদী একটা শশা চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "কে এখন গেলাস খুঁজে বেড়ায় ?"

সুভাষিণী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল ;—সে বলিল, "ছি, আহ্লাদী, মামার তেষ্টা পেয়েছে, এমন কথা কি বলে ?—আমি তোমাকে জল এনে দিচ্ছি মামা !"

সুভাষিণী গামছা পরিয়া তাড়াতাড়ি তাহার দিদি-মার কলসী হইতে এক গেলাস জল আনিয়া মামাকে দিল।—তাহার পর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মামা, তুমি বড্ড ঘেমেছ যে !—একটু বাতাস করবো ?"

কথাটা মামীর কাণে গেল। সে বলিল, "ও বাবা ! এইটুকু মেয়ের এত শয়তানী ? কলিতে আরও কত দেখ্‌বো ! এখনই মামাকে ভুলোনার চেষ্টা ? হারামজাদী দেখ্‌ছি আমার আহ্লাদীকে পর করে দেবে !"

প্রাণগোপাল সুভাষিণীর কথায় ও ব্যবহারে ক্রমে তাহার প্রতি যত আকৃষ্ট

হইতে লাগিলেন, গৃহিণীর আক্রোশ দিন দিন ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মেয়ের দুষ্টামীর জন্য প্রাণগোপাল আহ্লাদীকে গালি দিতেন ; আহ্লাদীর মা মনে করিত, "মেয়েটাকে ও দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না, একচোখা মিন্‌সে !"

কিন্তু প্রাণগোপালের উভয় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সমান ছিল। তিনি আহ্লাদীকে ও সুভাষিণীকে কাপড় চোপড়, পুতুল, জামা সমান ভাবে দিতেন। তিনি বলিতেন, "আহা ! মেয়েটা বড় হতভাগা। মা নেই, বাপ থাক্‌তেও নেই ; আমি যদি ওর মুখের দিকে না চাইব, তবে ওর গতি কি হবে ?"

গৃহিণী বলিত, "ও আর আহ্লাদী সমান ? ইচ্ছা করে, তোমার সংসার ছেড়ে দিনকতক মায়ের কাছে গিয়ে থাকি।"

প্রাণগোপাল একটা তীব্র বিদ্রূপের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,"তার পরদিন তোমার মা আমার কাছে ছুটে আস্‌বেন। তাঁর সঙ্গে আবার চাল ডাল পাঠাতে হবে ত?" নয়নতারার পিতৃগৃহের অবস্থা এইরূপ সচ্ছল ছিল।

"কি ! আমার মায়ের ঘরে ভাত নেই ? তুমি তাঁকে চিরদিন ভাত কাপড় দিয়ে পুষ্‌চো ! ও মা ! ঘেন্নায় মলাম যে ! আমি গালে-মুখে চড়িয়ে মরবো। আমার মা বাপের খোঁটা !"—প্রাণগোপালের প্রাণাধিক নয়নতারা ফোঁৎ-ফোঁৎ শব্দে নাক ঝাড়িতে লাগিল। অশ্রুধারায় অবগুণ্ঠন (কারণ শাশুড়ী নিকটে ছিলেন) ভিজিয়া গেল। সাধ্বী শাঁখা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে, প্রাণগোপালের মাতা অনেক মিষ্ট কথায় বধূকে নিরস্ত করিলেন।

মধ্যাহ্নকালে প্রাণগোপাল বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে আহ্লাদী একখানি কঞ্চি লইয়া বাতাবি নেবুর গাছ ঠেঙ্গাইতে লাগিল ; সুভাষিণী তাহার মামার মাথার কাছে বসিয়া পাকা চুল তুলিতে তুলিতে বলিল, "মামা, তুমি যে 'নিলেম্বরী'খান দিয়েছ, ও আমি পরবো না।—আমাকে একখানা মোটা কাপড় এনে দিও। মামীমা বলেন, আমি বাপে-খেদানো মেয়ে, ও রকম ভাল কাপড় আমাকে মানায় না।"

প্রাণগোপাল বলিলেন, "তোর মামীমার যেমন কথা !"

প্রাণগোপালের মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন সুভাষিণী মায়ের অভাব জানিতে পারে নাই। দিদিমার মৃত্যুর পর তাহার বুক যেন খালি হইয়া গেল। সে ভাবিল, "সকলেরই মা আছে, আমার মা নাই কেন ?—সবারই বাপ মেয়েকে আদর করে, ভালবাসে ; আমার বাবা কখন আমাকে দেখ্‌তেও আসেন না।"—সংসারে সকলের অবস্থা সমান নয় কেন, বালিকা এ সমস্যা বুঝিতে পারিত না।

মায়ের মৃত্যুর পর প্রাণগোপাল সুভাষিণীর সুখস্বচ্ছন্দতার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু নয়নতারার উৎপীড়ন হইতে ভাগিনেয়ীকে রক্ষা করেন—তাঁহার এরূপ শক্তি ছিল না। যেখানে রমণীর অধিকার অক্ষুণ্ণ—সেখানে পুরুষের শক্তি পরাহত।

সুভাষিণী অল্পবয়সেই তাহার দুর্ভাগ্যের কথা বুঝিতে শিখিয়াছিল। সে যদি আহ্লাদীর মত দুরন্ত হইত, তাহা হইলে সংসারে তাহার স্থান হইত না। সমস্ত দিন মামীমার 'ফরমাস' খাটিয়া রাত্রে সে মেঝের এক পার্শ্বে একখানি জীর্ণ মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িত। মামী-মার শয্যাপ্রান্তে সুভাষিণীর স্থান ছিল না।—প্রাণগোপাল একদিন রাত্রে স্ত্রীকে বলিলেন, "সুভা ছেলে মানুষ, নীচে একা শুতে পারে না, চৌকীতে ওকে একটু জায়গা দিলে দোষ কি ?"

নয়নতারা নথ ঘুরাইয়া বলিল, "দোষ ত কিছুতেই নেই,—ঐ একখানা ছোট চৌকীতে ছেলে মেয়ে দু'টি নিয়ে আমারই জায়গা হয় না। 'আপ্‌নি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে !" ভাগ্‌নীর 'দুঃখু' দেখে এত কষ্ট হয়ে থাকে তো একখান নূতন চৌকী এনে দাও না।"

প্রাণগোপাল বলিলেন, "অপরাধ হয়েছে, এমন কথা আর বল্‌বো না।"

নয়নতারা ছাড়িবার পাত্রী নহে, সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "না, যত অপরাধ—সব আমার !—ইচ্ছে করে, এমন সংসারের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে যে দিকে দুই চোখ যায়, চলে যাই।"

প্রাণগোপাল অন্তিম সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন, "না, তুমি চলে যাবে কেন ? তোমার অত্যাচারে আমাকেই বিবাগী হ'য়ে চলে যেতে হবে।—মেয়েটা যেন তোমার চক্ষুঃশূল !"

প্রাণগোপাল আর ক্ষণমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া খড়ম পায়ে দিয়া হুঁকা লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে চলিলেন। বালক ভৃত্য গৌরে বাগ্‌দী বিচালীর বালিশে মাথা রাখিয়া বারান্দায় পড়িয়া নাক ডাকাইতেছিল। কর্ত্তার খড়মের শব্দে সে 'ধুড়মুড়' করিয়া উঠিয়া বসিল ; তাহার পর উভয় চক্ষু ডলিতে-ডলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণগোপাল বলিলেন "শীগ্‌গির এক ছিলিম তামাক সাজ।—আলোটা নিব্‌লো কেমন করে রে ?'

বেগুনগাছে ও শাকের ক্ষেতে জল দিয়া গৌরের শ্রান্তিবোধ হইয়াছিল, তাই সে বিচালীর বালিশ মাথায় দিয়া মুদিতনেত্রে নাসাগর্জ্জনসহকারে শ্রান্তি দূর করিতেছিল। প্রদীপটা জ্বালিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাতে যে একটু তেল আনিয়া দিবে, সেটুকু বিলম্বও সহে নাই। কিন্তু সে কৈফিয়তে চুকিল না, বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, একটা জোনাই পোকা 'পিদিমে' পড়বার যো 'হয়েল', তাই

'পিদিম'টা নিবিয়ে দিয়েছি। আপুনি যে কর্ত্তা বুলেছিলেন, জোনাই পোকা 'পিদিমে' পড়া দোষ !"

প্রাণগোপাল বলিলেন, "বেশ করেছিস, এখন আলো জ্বাল।"

গৌরে বলিল, "তা হ'লে কর্ত্তা, মেচ-বাক্সোটা মা ঠাগ্রুণের কাছ থেকে নিয়ে আসি।"

প্রাণগোপাল তাড়াতাড়ি বলিলেন,"তার আর দরকার নেই ; তোর চক্‌মকি বের কর।"

গৌরে বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, শোলাখানা পুড়ানো নেই, আর আহ্লাদী বিড়াল তাড়াতে পাথরখানা কোথায় ফেলে দিয়েছে, খুঁজে পাইনি।"

প্রাণগোপাল বলিলেন, "তবে থাক্ তামাক। আমার খোল্‌খান পাড়। দেখিস্, যেন ফেলে ভাঙ্গিস্‌নে ; যদি ভাঙ্গিস্, তবে তোকেও গুঁড়ো করবো।"

গুঁড়া হইবার ভয়ে গৌরে অতি সাবধানে খোল্‌খানি দেয়ালের 'দাণ্ডি' হইতে পাড়িয়া প্রাণগোপালের হাতে দিল। প্রাণগোপাল সতরঞ্চিতে বসিয়া খোলে মৃদু আঘাত কবিয়া সঙ্কীর্ত্তন ধরিলেন,—

"আজু বৃন্দাবনে এ কি শোভা নেহারি।"

মৃদঙ্গধ্বনি শুনিয়া পাড়ার পাঁচ জন হরিসঙ্কীর্ত্তনে যোগদানের জন্য প্রাণগোপালের বৈঠকখানায় সমাগত হইল। তখন জোরে-জোরে খোল বাজিতে লাগিল ; খোল ও করতালের শব্দে নৈশ পল্লীপ্রকৃতি প্রতিধ্বনিত হইযা উঠিল। নূতন করিয়া গান আরম্ভ হইল,—

"সঙ্কীর্ত্তন মাঝে আমার গৌর নাচে।"

ভৃত্য গৌর তখন গোয়ালঘরে সাঁজালের কাছে গিয়া সাঁজালের আগুনে কল্‌কে বোঝাই কবিযা হুঁকা টানিতে লাগিল।

বাহিরে এত ধূম, কিন্তু অন্তঃপুরে সুভাষিণীর চক্ষুতে নিদ্রা নাই ; সে মামামামীর প্রেমালাপ শুনিয়াছিল, চক্ষুর জলে তাহার বালিশ ভিজিয়া গেল।

মামী ডাকিল, "সুভা ওঠ্, কুয়ো থেকে এক ঘটী জল তুলে আন্।"

সুভাষিণী ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠিয়া বসিল ;—বলিল, "মামীমা, বাইরে বড় আঁধার, একা যেতে ভয় করে।"

নয়নতারা কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়া বলিল, "ভয় করে ? কচি খুকী !—উনি জল তুলতে যাবেন, একজন বাঁদীকে ওর সঙ্গে পাহাবায় পাঠাতে হবে ! এত সুখে আর কাজ নেই ; যা, শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়।—আহ্লাদী ভাত খেয়েছে, এঁটোটা এখনও পরিষ্কার করা হয়নি !—প্রদীপ জ্বাল্‌তে-না-জ্বাল্‌তে ঘুম !"

সুভাষিণী ঘটী লইয়া কুয়ায় জল তুলিতে গেল। কুয়া সেখান হইতে অনেক

দূরে ; পাশে শশার টাল, দুটো ইঁদুর টালের উপর 'কিচির মিচির' করিয়া উঠিল। ভয়ে সুভার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল।—সে কোনও রকমে এক ঘটী জল তুলিয়া ঘরের দিকে আসিয়াছে, এমন সময় বাড়ীর পাশের প্রকাণ্ড বকুল গাছের ডালে বসিয়া একটা হুতুমপ্যাঁচা অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে ডাকিল, "তু-থুলি !"

সুভাষিণী ভয়ে দৌড়াইতে গিয়া একখানি ইঁটে বাধিয়া পড়িয়া গেল। ঘটীর সমস্ত জল তাহার কাপড়ে ঢালিয়ে পড়িল, খোলায় তাহার কপাল কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিল ; সে কষ্টে বলিল, "মা গো !"

যে মাতৃহীন, সেও অসময়ে মাকে ডাকে।

শব্দ শুনিয়া নয়নতারা উগ্রচণ্ডামূর্ত্তিতে দীপ-হস্তে বাহিবে আসিল ; সে সুভাকে না তুলিয়া—সে জল ফেলিয়া দিয়াছে বলিয়া তীব্র কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল, এবং পরদিন তাহার ভাত বন্ধ করিবে বলিয়া রায় প্রকাশ করিল।

গোলমাল শুনিযা হুঁকা ফেলিয়া গৌরে সেখানে আসিল। গৌরে এই মাতৃহীনা বালিকাকে স্নেহ করিত। ঘরে যাহার আহা বলিবার কেহ নাই, পরে তাহার বেদনায় হাত বুলাইয়া দেয়। গৌরে সুভাষিণীর হাত ধরিয়া তুলিল, ন্যাকড়া ভিজাইয়া তাহার কাপলে জলপট্টী বাঁধিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে শয়নকক্ষের দ্বারে রাখিয়া আসিল : সে বাগদীর ছেলে, শয়নকক্ষে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল না।

নয়নতারা হাঁকিল, "বাগদীকে ছুঁয়েছিস্, ও কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুক্‌তে পাবিনে।"—

সুভাষিণী চালের 'বাতা' হইতে একখানি জীর্ণ মলিন বস্ত্র টানিয়া লইয়া তাহাই পরিয়া ঘরে শুইতে গেল। চক্ষুর জলে সে পথ দেখিতে পাইল না ; কেবল অভ্যাস ছিল বলিয়া টলিতে-টলিতে কোনও রকমে সে তাহার মাদুরখানার উপর গিয়া পড়িল। কপালের বেদনায় সমস্ত রাত্রি বালিকা ঘুমাইতে পারিল না। গভীর রাত্রে পিপাসায় কাতর হইয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে মামীমার নিকট একটু জল চাহিল !—কিন্তু তাহার কোনও সাড়াশব্দ পাইল না।

তখন সে অতি কষ্টে উঠিয়া কলসী হইতে এক 'পাউলি' জল লইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

নয়নতারা বলিল, "এই রাত দুপুরে পেটে সাগর ঢুকেচে ! ধন্যি মেয়ে বাবা, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে। কত পাপ করেছিলাম, তাই এমন আবাগের বেটীকে ভাত-কাপড় দিয়ে পুষ্‌তে হচ্ছে !"

ক্রমে পূজা আসিল। সপ্তমীপূজার দিনে প্রাণগোপাল গ্রাম্য বাজার হইতে

দুইখানি পেঁয়াজ-রঙের শাড়ী আনিয়া একখানি আহ্লাদীকে ও অন্যখানি সুভাষিণীকে প্রদান করিলেন।

আহ্লাদী বায়না ধরিল, "ও দু'খান কাপড়ই আমি নেব।"

নয়নতারা বলিল,.,সুভা তোর কাপড়খান আহ্লাদীকে দে। তোর অনেক কাপড় আছে, তাই পবে' পুজো দেখিস্ ; নতুন শাড়ী না হলেও পুজো দেখা যায়।"

সুভাষিণী বিনা-প্রতিবাদে শাড়ীখানি মামীমার হাতে দিল ; তাহার পর সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাসন মাজিতে গেল। সংসারের যত বাসন, সমস্তই তাহাকে প্রত্যহ পরিষ্কার করিতে হইত।

সন্ধ্যার সময় প্রতিবেশী গাঙ্গুলীবাড়ীতে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল ; মা দুর্গার আরতি আরম্ভ হইল। ধূপের সৌরভে চারিদিক পূর্ণ হইল। গ্রামের স্ত্রী পুরুষেরা দলে দলে গ্রাম্যপথে পূজাবাড়ীতে আরতি দেখিতে ছুটিল। নয়নতারা আহ্লাদীকে লইয়া আরতি দেখিতে চলিল ; সুভাষিণীকে ডাকিল না, সে-ও তাহার সহিত যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

মামীমার এতদিনের দুর্ব্যবহারে—উপেক্ষায় ও বিরাগে বালিকার শিশুহৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল ; কিন্তু আজ তাহাকে ফেলিয়া আহ্লাদীকে লইয়া পূজা দেখিতে যাওয়ায় তাহার যত কষ্ট হইল, মামী-মার অন্য দিনের নানাপ্রকার কঠোবতর ব্যবহারেও তাহার তত কষ্ট হয় নাই।—সুভাষিণী ঘরেব বারান্দার একপাশে বসিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। শারদ-সপ্তমীর খণ্ড চন্দ্র মধ্যাকাশে বসিয়া রজতকিরণধারায় ধরাতল প্লাবিত কবিতেছিল। শবতের নির্গলিতাম্বু গর্ভ শুভ্র মেঘগুলি চন্দ্রকরোজ্জ্বল অম্বরপথে অতি ধীরে ভাসিয়া যাইতেছিল। বকুল বৃক্ষেব নিবিড় পল্লবরাশির অন্তরালে বসিয়া একটা পাখী মধ্যে মধ্যে 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' শব্দে নৈশ-প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। গৃহপ্রান্তবর্ত্তী ডোবার ধারে অযত্নসম্ভূত রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে সদ্যো-বিকশিত রজনীগন্ধাস্তবকের মৃদুগন্ধ সুশীতল নৈশ-সমীরণপ্রবাহে ভাসিয়া চতুর্দ্দিক সৌরভাকুল কারতেছিল। পূজাবাড়ীতে আরতির ঢাক তুমুল শব্দে বাজিয়া-বাজিয়া তখন থামিয়া গিয়াছিল ; কেবল ভূ-বিবরমধ্যবর্ত্তী ঝিল্লীর অশ্রান্ত তানপুরা তখনও নীরব হয় নাই। দূর বনে কদাচিৎ দুই একটা নিশাচর পক্ষীর বিকট কণ্ঠস্বর রজনীর গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছিল ; এবং গ্রাম্য-নরনারীগণ আরতি দেখিয়া গৃহে ফিরিতেছিল।

বালক-ভৃত্য গৌরে গরুব জাব্‌না মাখিয়া দিয়া হাত ধুইয়া তাহার নূতন 'ফোতা' (চাদর)-খানি মাথায় বাঁধিল ; তাহার পর তৈলপক্ক বাঁশের লাঠিখানি

লইয়া পূজা দেখিতে বাহির হইবে, এমন সময় রুদ্যমানা সুভাষিণীর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে তৎক্ষমাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া সহানুভূতিভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে? সুভা দিদি না কি? তুমি পূজা দেখ্‌তে যাওনি?"

সুভাষিণী কোনও কথা না বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। গৌরেরও মা ছিল না, সে সুভাষিণীর মনের কষ্ট বুঝিতে পারিল। সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মা ঠাক্‌রুণ তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যায়নি? কেঁদ না দিদি! চল, আমি তোমাকে ঠাকুর দেখিয়ে আনি। আরতির সময় লোকের ভিড়ে 'পিত্তিমে-দর্শন' হয় না, তাই আমি এতক্ষণ যাইনি, গাই কটাকে জাব্‌না দিচ্ছিলাম। এখন আর বেশী ভিড় নেই, চল, তোমাকে দেখিয়ে আনি।"

সুভাষিণী মলিন-বস্ত্রেই গৌরের সঙ্গে প্রতিমা-দর্শনে চলিল।

গাঙ্গুলী-বাড়ীতে প্রতিমার সোনালি সাজ। দেওয়ালগিরি ও ঝাড়ের আলোকরাশি ডাকের সাজে ও প্রতিমার মুখে প্রতিফলিত হইতেছে। দশপ্রহরণ-ধারিণী মা দুর্গার নথশোভিত মুখের কি প্রশান্ত ভাব! সুভাষিণীর হৃদয় ভক্তিতে, আনন্দে পূর্ণ হইল; সে 'ঠাকুর-দালানে' উঠিয়া দেবীচরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিল; মনে মনে বলিল, "মা, তুমি এত গহনা পোরে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ী এসেছ,—তুমি সকলের মা, আমার দুঃখ তবে দূর কর না কেন? আমারও তা বাবা আছেন, তিনি একবারও আমার খোঁজ নেন না। এই পূজার সময় বাপে মেয়েদের কত ভাল ভাল কাপড় জামা গহনা দিয়াছেন আর আমার বাবা আমাকে ভুলে আছেন! মা, আমাকে তুমি আমার বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও, মামীমার কাছে আর আমি থাক্‌তে পারচিনে।"—অভিমানিনী বালিকার অশ্রুপ্রবাহে তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল।

মামীমাব বকুনির ভয়ে সুভাষিণী সেখানে অধিক বিলম্ব করিতে পারিল না। দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গাকে তাহার কাতর প্রার্থনা জানাইয়া গৌবের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

প্রাণগোপাল তখনও পূজা দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই। চণ্ডীমণ্ডপে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, অদূরে একখানি জলচৌকীর উপর বসিয়া এক জন লোক বোধ হয় গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সুভাষিণীকে অন্তঃপুরে প্রবেশোদ্যতা দেখিয়া আগন্তুক ডাকিলেন, "কে যায়? সুভা না কি?"

সুভাষিণী চলিতে-চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ফিরিয়া বলিল, কে? বাবা!"

হরিশ চাটুয্যে দুই বৎসর পরে আজ সপ্তমীর রাত্রে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

দুই বৎসর পরে পিতা-পুত্রীতে সাক্ষাৎ ! সুভাষিণী পিতার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল ; হরিশ নীরবে কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তিনি কি বলিয়া অভিমানিনী কন্যাকে সান্ত্বনা দান করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে সুভাষিণী মুখ তুলিয়া কোমলদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, তবে তুমি আমাকে ভুলে যাও নি ? আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে, বাবা ?"

হরিশ গাঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ মা, আমি তোমাকেই নিতে এসেছি। এবার ভিক্ষে-শিক্ষে করে' মা জগদম্বাকে ঘরে এনেছি ; কিন্তু কাল রাত্রে মা আমাকে স্বপন দিয়েছেন, "তুই তোর মেয়েকে অনাহারে পরের বাড়ী ফেলে রেখে আমাকে ঘরে এনেছিস্ ! তোর মত নিষ্ঠুর বাপের পূজা আমি গ্রহণ করবো না। যদি আমার পূজা ক'রতে চাস্ ত তোর মেয়েকে ফিরিয়ে আন্।'—তাই মা ! এই পাঁচক্রোশ পথ হেঁটে, তোকে তাড়াতাড়ি নিতে এসেছি। চল্, বাড়ী যাই, গাড়ী ঠিক হয়েছে ; আর আমি আমার মাকে কাছ-ছাড়া করবো না।"

প্রাণগোপাল গৃহে ফিরিয়া ভগিনীপতির মুখে সকল কথা শুনিলেন। তিনি বিষণ্নমনে ভাগিনেয়ীটিকে বিদায় দিলেন।—আপদ গেল, ভাবিয়া নয়নতারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সুভাষিণী বাড়ী আসিয়াই চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া ভক্তিভরে মা দুর্গাকে প্রণাম করিল ; বলিল, "মা, তুমি বছরে-বছরে আমাদের বাড়ী এসো, তা হ'লে আমি বাবার কাছে থাকতে পাব।"

দ্বিতীয় স্তবক

পরিত্যক্তা

[১]

হরিশপুরের শ্রীদাম বাঁড়ুয্যে গ্রাম্য জমীদার গাঙ্গুলীদের ঘরজামাই হইয়া সর্ব্বপ্রথম কোন্ সালের কোন্ তারিখে শ্রীধাম হরিশপুরে পদার্পণ করিয়ছিলেন, তাহা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের 'বিশ্বকোষে'ও যখন পাওয়া যায় না—তখন আমাদিগকে তাহার আবিষ্কারচেষ্টায় অগত্যা বিরত হইতে হইল।

যাহা হউক, তদবধি তিনি গাঙ্গুলীদের ন'কর্ত্তা জগমোহন গাঙ্গুলীর ঘরজামাইরূপে হরিশপুরে সংস্থাপিত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে জগমোহনের পুত্রগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় শ্রীদাম অবশেষে শ্বশুর-মন্দিরের পশ্চাতে একটা জঙ্গলের ধারে খড়ো বাড়ী করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি শ্বশুরের নিকট কিছু কিছু মাসহারা পাইতেন ; কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর শ্যালকেরা তাঁহার এই মাসহারা বন্ধ করিয়া দিলেন। কুলীনশ্রেষ্ঠ শ্রীদাম ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ; শ্যালকদেব ভয় দেখাইলেন,—হয় তিনি মামলা করিয়া পাদুকাপ্রহারে মাসহারা আদায় কবিবেন, না হয় আর একটা বিবাহ করিয়া শ্যালকত্রয়কে জব্দ করিবেন।—কিন্তু তাঁহার এই ভয়প্রদর্শনে কোনও ফল হইল না। উকীলেরা বলিলেন, মামলা করিলে হারিতে হইবে, কারণ স্বর্গীয় কর্ত্তার উইলে মাসহারার উল্লেখ নাই , এবং দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহও ঘটিয়া উঠিল না, যেহেতু, তাঁহার পত্নী বিরাজমোহিনী উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জানাইলেন, তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে শ্রীমতী অহিফেনসেবনে সকল জ্বালা জুড়াইবেন---সুতরাং না হইল মামলা, না হইল বিবাহ। শ্রীদাম অনন্যোপায় হইয়া সংসার প্রতিপালনের জন্য পাঁঠার মাংসের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন।

কশাইগিরি করিয়া কোনপ্রকারে সংসার চলিল। কিছু দিনের মধ্যেই হরিশপুর গ্রামে শ্রীদাম সমধিক প্রসিদ্ধি লার্ভ করিলেন। গ্রামের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে 'পাঁঠা-ব্যাচা বাঁড়ুয্যে' এই উপাধি প্রদান করিল।

কোন বন্ধু বলিল, "শ্রীদাম, তুমি বড় লোকের জামাই, নিজে একজন মহাকুলীন ; তোমার কি এ ব্যবসা সাজে ?"

শ্রীদাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ব্যবসা ?"

"এই পাঁঠা ব্যাচা।"

শ্রীদাম রাগ করিয়া বলিলেন, "আজকাল পাঁঠা ব্যাচে না কে ? আমি যেন

চার-পেয়ে পাঁঠা বিক্রয় করি, আর গাঁয়ের 'হুম্‌রো-চুম্‌রো' মশায়রা যে দো'পেয়ে পাঁঠা হাজার-হাজার টাকায় বিক্রী ক'রছেন ! যে পাঁঠার যতটা বেশী পাশ, তার দাম তত বেশী ! বাবা, দু'হাজারটাকায় দো'পেয়ে পাঁঠা বিক্রী কর্‌লে দোষ হয় না, আর আমি দেড টাকায় চার-পেয়ে পাঁঠা বিক্রী করি ব'লে তোমরা আমাকে দশ কথা শুনোতে এসেছ ? কলিতে বিচার নাই !"

যুক্তির সারবত্তা দেখিয়া প্রশ্নকর্ত্তা লজ্জায় চম্পট দান করিল।

[২]

পাঁঠার অভিসম্পাতেই হউক, আর কাল পূর্ণ হওয়াতেই হউক, পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে শ্রীদাম ঠাকুর পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

গ্রামের কেহ কেহ বলিল, "এত দিনে পাঁঠাগুলো বাঁচ্‌লো !"

কেহ কেহ বলিল, "কিন্তু ছেলেটা যে না খেতে পেয়ে মো'ল।"

শ্রীদামের আঠার বৎসর বয়স্ক পুত্র দামোদব পিতার মৃত্যুতে সংসার অন্ধকার দেখিল। কি করিয়া চলিবে স্থির করিতে না পারিয়া, তাহার পিতা যে কয়টি পাঁঠা 'জিয়াইয়া' রাখিয়াছিলেন, সে তাহা একে একে কাটিয়া ভক্ষণ করিল।—পুঁজি ফুরাইয়া গেল, অথচ উদরে ক্ষুধার অভাব রহিল না।

দামু কি করিয়া সংসার চালাইবে, মাথায় হাত দিয়া তাহাই ভাবতেছে, এমন সময় হরিশপুরের ডাক্তার নিবারণ চৌধুরী তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

নিবারণবাবু পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও ডাক্তারের কম্‌পাউণ্ডাব ছিলেন ; কম্‌পাউণ্ডারী করিতে করিতে তাঁহার ডাক্তার হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিযাছিলেন, ডাক্তারী ব্যবসায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ ঔষধ-মিশ্রণ। এই কার্য্যে যখন তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তখন পরের দাসত্ব করিয়া কি হইবে, স্বাধীন ভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

অতঃপর নিবারণ হরিশপুরে ডিস্‌পেন্সারী খুলিয়া অত্যন্ত উৎসাহে ডাক্তারী করিতে লাগিলেন ; তিনি যেবার হরিশপুরে ডাক্তারী আরম্ভ করেন, সেইবার হরিশপুর ও তাহার সন্নিহিত গ্রামসমূহে ৭৯৩ জন লোক বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করে ; তাহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে সাতশত রোগীর চিকিৎসার ভার নিবারণ ডাক্তাব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সব্যসাচী ছিলেন, এক হস্তে হোমিওপ্যাথি ও অন্য হস্তে এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন। হোমিওপ্যাথিতেই তাঁহার অধিক হাতযশ ছিল, নির্দ্দোষ হোমিওপ্যাথির ঔষধ

সেবনে রোগী ভুগিত বটে, কিন্তু মরিত কম ; কিন্তু এলোপ্যাথিতে তিনি উদরাময়ে চক্ষুরোগের ঔষধ দিতেন, সুতরাং রোগীকে অবিলম্বে চক্ষু মুদিতে হইত।—যে রোগী বাঁচিত লোকে তাহার দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিত, "নিবারণ ডাক্তারের কি হাতযশ, যেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী ! একদাগ ঔষধ পেটে পড়েছে কি না পড়েছে—অমন বিকারের রোগী উঠে বসে !—ভাগ্যে নিবারণ ডাক্তারের দাওয়াই খেয়েছে, তাই বাঁচ্‌লো।" কিন্তু যে মরিত, লোকে বলিত, "উহার পরমায়ু ফুরাইয়াছে, ডাক্তারের ঔষধে কি ফল হইবে !"

এরূপ যাহার হাতযশ ও পসার, তাহার টাকা জমিতে অধিক দিন লাগে না। নিবারণ ডাক্তার দুই বৎসরের মধ্যেই পাকা ডিস্‌পেন্সারী করিয়া ফেলিলেন। কলিকাতার বাথগেট্‌ ও স্মিথ্‌ ষ্ট্রানিস্‌ষ্ট্রীটের দোকান ছাড়া অন্য স্থান হইতে ঔষধ আনাইতেন না।—গ্রামের অন্য ডিস্‌পেন্সারীতে যে ঔষধের দাম দুই আনা, নিবারণ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীতে তাহার মূল্য ছয় আনা ! কেহ এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিবারণ সহাস্যে বলিতেন, "আমি ত 'নেটিভ্‌ ফারম্‌' থেকে ঔষধ আনাই না যে, জলের দামে ঔষধ দেব। আমার ঔষধ বিলাতী ফারম থেকে আমদানী, অনেক দাম।"

কমলা যখন সদয়া হন, তখন তিনি অনুগৃহীত ভক্তকে নানা উপায়ে ধনবান করেন। নিবারণ ডাক্তার অর্থোপার্জ্জনের ফন্দীতে ওস্তাদ ছিলেন, সময় বুঝিয়া তিনি আর্শেনিক ও কুইনাইনের সংমিশ্রণে 'অমৃতসার' নামক ঔষধ আবিষ্কার করিলেন। জ্বরের ঔষধ, কিন্তু তাহাতে প্রেমজ্বর পর্য্যন্ত আরোগ্য হয় ! এই ঔষধ-সেবনে জ্বরাক্রান্ত অনেক রোগীর আশু উপকার হইল বটে, কিন্তু শেষে তাহারা হাত-পা ফুলিয়া মরিতে লাগিল। তথাপি নিবারণের ঔষধ হু-হু করিয়া কাটিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে ঔষধের এজেন্ট নিযুক্ত হইল। সংবাদপত্রে 'অমৃতসারে'র কলম-কলম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতে লাগিল। বড় বড় ডাক্তার পর্য্যন্ত 'অমৃতসারে'র সুখ্যাতি করিয়াছেন, এই মর্ম্মে প্রশংসার ঢাক বাজিতে লাগিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, সেই সকল ডাক্তার বহুদিন পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তাক্ষর সনাক্ত করিবার জন্য কাহারও মাথা ব্যথা করিল না।

[৩]

এইরূপে দ্রুত ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়ায় নিবারণের একতালা ইমারত দোতালা হইল। গবর্মেন্ট তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রদান

করিলেন ; এবং তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে হরিশপুরের মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি 'টাক-রাজ' নামক একটি 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশতৈল আবিষ্কারের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় কন্যাদায়ে তাঁহাকে বিলক্ষণ বিব্রত হইয়া উঠিতে হইল।

নিবারণের কন্যা শৈলবালা কুরূপা নহে, কিন্তু বাতরোগে তাহার একখানি হাত ও একখানি পা পঙ্গু ; ইহার উপর সে একটু তোত্‌লা এবং কানে কিছু কম শুনিত। আজকাল ভদ্রলোকের ঘরে এমন মেয়ে অচল—এ কথা না বলিলেও চলে। ভাগ্যবান নিবারণ সুপাত্রের অনুসন্ধানে চারিদিকে চিঠি-পত্র লিখিয়াছিলেন, ঘটকও পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু কন্যার অঙ্গহীনতার কথা শুনিয়া কেহই সে কন্যা ঘরে আনিতে সম্মত হইল না। অর্থের প্রলোভন নিষ্ফল হইল দেখিয়া নিবারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।—তাঁহার ধারণা ছিল, বিবাহে যৌতুকটাই প্রধান লক্ষ্য, 'কনে' উপলক্ষ্য মাত্র। উপলক্ষ্যের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটিতে যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহাদের মত 'বেকুব' সংসারে কয় জন আছে ? আট টাকা বেতনের কম্‌পাউণ্ডার নিবারণ চৌধুরী অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে মাসিক পাঁচ-শতাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া মনে করিতে লাগিলেন, অর্থবলে কেবল সামাজিক মানসম্ভ্রম নহে, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত ক্রয় করা সহজ।

কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, দেশের অধিকাংশ লোকই বোকা, অর্থলোভে কেহই তাঁহার 'অচল' কন্যাকে গ্রহণ করিতে সম্মত নহে ; তখন হরিশপুরের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান যুবক দামোদরের কথা তাঁহার মনে পড়িল।

দামোদর কষ্টে-সৃষ্টে তাঁহার স্কুল হইতেই মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল ; তাহার পর পৈত্রিক অস্থাবর সম্পত্তি পাঁঠাগুলি গলাধঃকরণ করিয়া, কি করিয়া সংসার চালাইবে এই কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় নিবারণ তাহাকে স্মরণ করিলেন;—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ভাদ্রমাসের সন্ধ্যা। গ্রামের গর্ত্ত ডোবা ও পুষ্করিণীগুলি জলে পরিপূর্ণ, তাহার উপর নির্ম্মল শরৎ-চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া জলরাশি দ্রব রৌপ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। গৃহস্থের গোশালায় 'সাঁজালে'র ধোঁয়া উঠিয়া যেন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে কাঁশর ঘণ্টা বাজিতেছে। বাদুড়ের দল বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক ফলাহারের সন্ধানে নিঃশব্দ পক্ষসঞ্চালনে দ্রুতবেগে উড়িয়া চলিয়াছে। একটা তেঁতুলগাছের ঘন পত্রের মধ্যে দুই তিন শত শালিক পাখী সমবেত হইয়া সন্ধ্যার মিলন-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে। একটা জলপূর্ণ ডোবার উপর অবস্থিত বাঁশবনের পাশে কতকগুলি শৃগাল ঊর্ধ্বমুখে সমস্বরে সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে।

কৃষককুটীরস্থিত মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকচ্ছটা ষষ্ঠীগাছের পাশ দিয়া বর্ষার আতটপূর্ণা তরঙ্গিণীর বক্ষে সুদীর্ঘ আলোক-শলাকাবৎ প্রতিফলিত হইতেছে, এবং অদূরবর্ত্তী খেয়াঘাটে বসিয়া একজন পথিক খেয়া নৌকার প্রতীক্ষায় রামপ্রসাদী সুরে উচ্চকণ্ঠে শঙ্করীর নিকট 'তবিলদারী'র প্রার্থনা করিতেছেন।

দামোদর ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়া একখানি ময়লা চাদর গলায় জড়াইয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে নিবারণ বাবুর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় প্রবেশপূর্ব্বক ফরাসের এক পাশে বসিল। নিবারণ তখন একটা স্থূলোদর বালিশে ঠেস দিয়া আল্‌বোলায় তামাক টানিতে-টানিতে সেই দিনের 'বেঙ্গলী'খানি দেখিতেছিলেন। তিনি যদিও ইংরাজী ভাষায় ঔষধের নামগুলি ভিন্ন আর কিছুই পড়িতে পারিতেন না, এবং ইংরাজীতে নামটি স্বাক্ষর করিতে মাঘমাসের শীতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেন, তথাপি 'বেঙ্গলী'র তিনি গ্রাহক ছিলেন, এবং প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে তাহার পাতাগুলি উল্টাইয়া বিদ্যাবত্তার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন।

ফরাসের উপর সিংক্লের 'পঙ্খাপ্রুফ্' 'ডবলউইক'-বিশিষ্ট সুবৃহৎ 'ডোম'ওয়ালা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। দামোদরের আবির্ভাবমাত্র নিবারণ 'বেঙ্গলী'খানা ফেলিয়া রাখিয়া বালিশের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সোজা হইয়া বসিলেন ; তাহার পর দামোদরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন হে দামু, আছ কেমন ? তোমাকে অনেক দিন দেখিনি। তোমার বাবা সর্ব্বদাই এ দিকে আস্‌তেন, খোঁজ খবর নিতেন ; তোমরা এ কালের ছেলে, খবরটা পর্য্যন্ত লও না ! তা তোমার শরীর ভাল আছে ত ? তোমার মা ভাল আছেন ?"

দামোদর নতমস্তকে বলিল, "হ্যাঁ, মা ভাল আছেন। মেসো মহাশয়, আপনি আমাকে ডেকেছেন ?"

দামোদর গ্রামসম্পর্কে নিবারণকে মেসো মহাশয় বলিত ; বোধ হয় একটু দূর সম্বন্ধও ছিল।

নিবারণ বলিলেন, "তোমার মার সঙ্গে আমি একবার দেখা করবো—অনেক দিন থেকেই মনে কর্‌চি ; তা আমার সময় কম। যাক্, আমার যা বলবার আছে—আমার মহুরী চক্রবর্ত্তীকে দিয়েই তা ব'লে পাঠাব। তোমাকে ডেকেছি কেন, বলি শোন। শুন্‌ছি, তোমাদের এখন সংসার চলাচলের উপায় নেই, খুব কষ্টে পড়েছ ; আর তুমি বেকার বসে আছ। আমার স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের চাকরী খালি আছে, দশটাকা মাইনে, এন্ট্রেন্সপাশ ও এল্-এ ফেল অনেকগুলি লোক দরখাস্ত করেছে ; নর্ম্মালে ত্রৈবার্ষিক পাশকরা কয়েকটি লোকও উমেদার আছে। তুমি যদি সে চাকরী কর্‌তে চাও ত কাজটা তোমাকেই দিতে পারি। কি বল ?"

দামোদর হাতে স্বর্গ পাইল ; দশ টাকা বেতনের চাকরী আপনা হইতে জুটিতেছে ! লক্ষ্মী এত দিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন । দামোদর তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া আসিল, এবং পরদিন হইতে সে হরিশপুরের মাইনর স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের 'টুল' অধিকার করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে দুগ্ধপোষ্য বালকগণের পৃষ্ঠে ও করতলে স্বীয় পাণ্ডিত্য মহিমা অঙ্কিত করিতে লাগিল ।

কিছুদিনের মধ্যেই দামু পণ্ডিতের এমন সুনাম প্রচারিত হইল যে, গ্রামের ছেলেরা 'বর্গি এলো' ছড়াটা শুনিলেই পিতামহীর অঞ্চলের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বর্গির পরিবর্ত্তে দামুপণ্ডিতের অস্তিত্ব কল্পনা করিত ।

[৪]

যথাসময়ে মুহুরী চক্রবর্ত্তী দামোদরের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবারণের কন্যার সহিত বিবাহের ঘটকালী করিয়া গেল । দামুর মা কিছু 'দাবী' করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাবী-দাওয়া করিলে বিবাহ হইবে না এবং দামুর চাকরী থাকিবে না, এইরূপ আভাস পাইয়া তিনি দাবী ছাড়িয়া দিলেন । নিবারণ চৌধুরী অতি অল্পব্যয়ে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন ; মনে মনে বলিলেন, "স্কুলের সেক্রেটারীর কাজটা হাতে ছিল, তাই বে-খরচায় কন্যাদায়ে উদ্ধার হইলাম ।—লোকে বলে, আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই ! নিবারণ চৌধুরী এমনই বোকা !"

পঙ্গু ও তোতলা, তাহার উপর কালা বৌ লইয়া ঘর করা সহজ নহে, বিশেষতঃ দামোদরের গৃহে অশন-বসনের যে সচ্ছলতা ! দামোদরের মা 'বৌমা'কে বাড়ী আনিতে সাহস করিলেন না, নিবারণ কন্যা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । তিনি ত দেখিয়া শুনিয়াই মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন ; তাঁহার আক্ষেপের কোনও কারণ ছিল না ।

কিছুদিন পরে নিবারণের চৈতন্য হইল । তিনি দেখিলেন, দামু দূরে দূরে থাকে, তাঁহার কন্যার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতে সম্মত নহে । তাঁহার কন্যা পঙ্গু হোক—তোত্‌লা হোক—বধির হউক,—তাহার যে একটি হৃদয় আছে ; এবং সে হৃদয় অন্যান্য বালিকার হৃদয়েরই অনুরূপ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন । কন্যাকে অসুখী ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া তিনি দামোদরকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন । দামোদরের বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিলেন, দামু যদি তাঁহার কন্যাকে ভালবাসে, তাহার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়, ও তাহাকে লইয়া 'ঘর' করে,—তাহা হইলে দামোদরের উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন ।

বুদ্ধিমান্ দামোদর এ প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। যে স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল। শৈলবালাকে সে কোন দিন একখানি সাবান, কোনদিন এক কৌটা সতীশোভনা সিন্দুর, কোনও দিন বা এক শিশি তরল আলতা আনিয়া দিয়া প্রণয়টা বেশ ঘনীভূত করিয়া তুলিল। শৈলবালার মুখে আবার হাসি ফুটিল। মা ছেলের দুর্ম্মতি দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহার আশা ছিল, ছেলের দু'পয়সা উপার্জ্জন বাড়িলে তিনি একটি টুকটুকে বৌ আনিয়া ঘরে তুলিবেন, নতুন বৌ লইয়া সংসার ধর্ম্ম করিবেন ; কিন্তু দামু তাঁহার এত আশা বুঝি বিফল করে!—মা এক একদিন দামুকে তাহার স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাতের জন্য মৃদু তিরস্কারও করিতেন, কিন্তু দামু কোনও কথা বলিত না ; শেষে একদিন সে জ্বালাতন হইয়া বলিয়া ফেলিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! আমি কি জন্য কি কর্‌ছি, তা তুমি কি করে বুঝবে?"

কিছুদিন পরে দামু পুত্রসন্তানের মুখ দেখিল। নিবারণ দেখিলেন, দামুর সংসার বাড়িতেছে, তাহার উন্নতির কোনও উপায় করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে দামুর সংসার তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। তিনি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দামুকে ঢাকার 'সার্ভে স্কুলে' জরিপ শিখিতে পাঠাইলেন। দামোদর অক্লান্ত পরিশ্রমে যথাসময়ে জরিপের পরীক্ষায় পাশ করিল।

এই সময় ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী হইবে বলিয়া গবর্মেণ্ট অনেক জমী কিনিতেছিলেন। গবর্মেণ্টের এক জন কন্ট্রাক্টর দামুকে বুদ্ধিমান দেখিয়া এবং তাহার পরিচয় লইয়া তাঁহার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। দামু তাঁহাকে বলিয়াছিল, তাহার স্ত্রী খঞ্জ, তোত্‌লা, কালা,—সে স্ত্রী লইয়া সংসার করা চলিবে না। কন্ট্রাক্টর বাবু সন্ধান লইয়া জানিলেন, দামুর কথা অতিরঞ্জিত নহে, সুতরাং বিবাহে কোনও আপত্তি হইল না। বিবাহের পর শ্বশুর কন্ট্রাক্টরের চেষ্টাতেই দামু এক জন ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেপুটী কালেক্টরের অধীনে একটি সদর-আমিনী পদ লাভ করিল।

কিছুদিনের মধ্যেই দামু দক্ষতাগুণে ডেপুটী কালেক্টরের দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিল। দামুর প্রতি তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস ; বড় বড় 'প্লট' ক্রয় করিতে হইবে, দামু জরীপ করিয়া, দর ঠিক করিয়া দিতে লাগিল ; তাহাই মঞ্জুর! দামু প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, যে জমীর চারি হাজার টাকা মূল্য, তাহার জন্য ছয় হাজার টাকা আদায় করিয়া দিত। জমীর অধিকারীর প্রাপ্য সাড়ে চারি হাজার, দামুর প্রাপ্য দেড় হাজার।

সুতরাং পঁয়তাল্লিশ টাকা মূল্যের দামু দুই বৎসরের মধ্যে বড়লোক হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইল, স্ত্রীকে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার অলঙ্কার দিল, এবং ব্যাঙ্কেও আট দশ আজার টাকা জমাইল! কিন্তু দামুর এ সুখ-সৌভাগ্যদর্শন নিবারণ চৌধুরীর ভাগ্যে ঘটিল না, তিনি হরিশপুরের তিন জন ডাক্তারের অবিশ্রান্ত চেষ্টা বিফল করিয়া ধর্ম্মরাজের আহ্বানে ডাক্তারী ছাড়িয়া এক অজ্ঞাত লোকে প্রস্থান করিলেন।

[৫]

দামু শৈলবালার নামও সহ্য করিতে পারে না। পিতার মৃত্যুর পর তাহার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না; চুলে তেল নাই, রুখু মাথা, পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, হাতে গাছকয়েক কাচেব চুড়ী। শৈলবালার দুই ভাই পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া পৃথক হইল। পেটেণ্ট ঔষধ ও তেলের ব্যবসায় এজমালিতেই চলিতে লাগিল। মা স্বতন্ত্র 'হাঁড়ি কাড়িলেন; তিনি শৈলকে দু'বেলা দুটি খাইতে দিতেন, তাই অভাগিনীর অনাহারে মৃত্যু হইল না।

কিন্তু কষ্ট ত আর সহ্য হয় না। শৈলবালা নিজের দুঃখ জানাইয়া স্বামীকে পত্র লিখিল. সে পত্রের প্রত্যেক ছত্র অশ্রুসিক্ত; কিন্তু সে পত্র পাইয়াও দামোদরের দয়া হইল না। সে তখন অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত, বাড়ীতে বন্ধুগণের মেলা; প্রত্যহ চায়ের 'পার্টিতেই' তাহার তিন চারি টাকা খরচ! তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাসদাসীবৃন্দে মুখরিত, তাহার নবীনা গৃহিণী কনকলতা নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া মৃদু মধুর হাস্যে তাহার হৃদয়ে শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি বিকীর্ণ করিতেছে; তাহার সুকুমার স্নেহভাজন পুত্রকন্যা অলঙ্কারপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এ সময় সেই পল্লীবাসিনী, পঙ্গু, তোত্‌লা অভাগিনীর কথা কিরূপে তাহার মনে পড়িবে? দূর পল্লীর এক প্রান্তে তাহারই যে প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র নৃত্যলাল মাঘের দারুণ শীতে পিঠে একখান ময়লা নেক্‌ড়া জড়াইয়া হিমে পড়িয়া ক্ষুধায় কাঁদিতেছে, আর তাহার মা তাহার অর্দ্ধনগ্ন দেহ বুক দিয়া ঢাকিয়া অশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত করিয়া বলিতেছে, "ভগবান আব কতদিন আমাকে এমন করিয়া পুড়াইয়া মারিবে! আহা, ছেলেটার কি গতি হবে?" তাহার সেই কাতর আর্ত্তনাদ দামোদরের কর্ণে প্রবেশ করিল না। দুই তিনখানি পত্র লিখিয়াও যখন শৈলবালা স্বামীর নিকট হইতে কোনও উত্তর পাইল না, তখন সে সকল আশা ত্যাগ করিল। সে মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমার ছেলেটার কি গতি হবে?"

মা বলিলেন, "পূজার সময় তো বাড়ী আস্‌বে—দেখা যাক ; আমি যে ক'দিন আছি, সে ক'দিন তোদের না খেয়ে মরতে দেব না।"

পূজা আসিল। এবার দামোদর মহাসমারোহে মহামায়াকে গৃহে আনিতেছে। মায়ের শুভাগমনে দামোদর বিলক্ষণ দশ টাকা ব্যয় করিবে, স্থির করিল। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে প্রকাণ্ড টাপোর বাঁধা হইল ; কলিকাতা হইতে অনেক টাকা ব্যয়ে সোনালী ডাকের সাজ আসিল। জমিদার গাঙ্গুলীবাড়ীর পূজায় বার ঢাক বাজিত। দামোদর ঢাকের সংখ্যায় গাঙ্গুলীদের পরাজিত করিবার সংকল্প করিয়া ষোল ঢাকের বায়না পাঠাইল। সকলে বুঝিল, নূতন বড়লোক দামোদর বাঁড়ুয্যে এবার ঢাকের আওয়াজে গ্রামের কানে তালা লাগাইবে।

দামোদর সপরিবারে ষষ্ঠীর দিন নৌকাযোগে গৃহে উপস্থিত হইল। দামোদর কর্ম্মস্থান হইতে বহু সামগ্রী সহ বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসিগণের মধ্যে মহা আন্দোলন আরম্ভ হইল। ঘাটে, পথে, রমণীসমাজে কেবলই দামোদরের কথা, তাহার সৌভাগ্যের কথা, তাহার দ্বিতীয়া পত্নীর অলঙ্কাব প্রাচুর্য্য ও তাহাদের গঠনকৌশলের কথা। গ্রাম দামোদরময় হইয়া উঠিল। পল্লীরমণীগণ দলে দলে দামোদরগৃহিণীকে দেখিতে ছুটিল। শৈলবালা ও তাহার জননীর কর্ণে সকল কথাই প্রবেশ করিতে লাগিল ; শৈলবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, "এ সকলই আমার হইতে পারিত ; কি পাপে এ ভাবে বঞ্চিত হইলাম ?" ভগবানের বিচার দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। শৈলবালার মা জামাতার অকৃতজ্ঞতার পরিচয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ; তাঁহার স্বামী যদি তাহাব উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে আজ এত ঐশ্বর্য্য, এত গহনা, এত সুখ কোথায় থাকিত ? দামোদর যখন তাহাদের গ্রামের বিদ্যালয়ে দশ টাকা বেতনে পণ্ডিতি করিত, তখন সে তাঁহাদের আশ্রিত ছিল, অনুগত ছিল ; তখন সে শৈলবালার মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। কিন্তু এখন দামুর অর্থ হইয়াছে, ঘরবাড়ী হইয়াছে, দশ জনে তাহাকে মানুষ মনে করিতেছে। এখন সে তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে অনিচ্ছুক, পরিণীতা পত্নীর কুশলবার্ত্তা-জিজ্ঞাসাতেও পরাঙ্মুখ। শৈলবালার মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। দামু বাড়ী আসিয়া গ্রামের গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের সহিত দেখা করিতে গেল। তাহার দুই হাতের আট অঙ্গুলীতে আটটা হীরকখচিত অঙ্গুরীয়, লেড্‌ল'র বাড়ীর শার্টের 'ফলস্ কলারে' যেন মুখ দেখা যায়! শার্টের সোনার বোতামের পালিস ঝক্-মক্ করিতেছে, আর "ডবল ব্রীজ্" প্যাটার্ণের সোনার চেনেরই বা শোভা কত! যাঁহারা পূর্ব্বে দামোদরকে মানুষ বলিয়া মনে করিতেন না, তাঁহারাও দামোদরকে দেখিয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। দামোদরের পিতা কুলীন, কিন্তু

কাঞ্চন-কৌলীন্যে দামোদর গ্রামস্থ সকল কুলীনকে পরাজিত করিয়াছিল। দামোদব পূজায় বাড়ী আসিয়া সকলের বাড়ী গেল,—গেল না কেবল তাহার প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ী। শৈলবালা এতদিন পরেও স্বামীর চরণদর্শন করিতে পারিল না, এই দুঃখই তাহাব অন্য সকল দুঃখকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সপ্তমীর সন্ধ্যায় যখন দামোদরের বাড়ীতে যোলটা পাখাওয়ালা ঢাক একসঙ্গে বাজিয়া গ্রাম তোলপাড় করিয়া তুলিল, তখন সেই বাদ্যধ্বনি শৈলবালার কর্ণে উৎকট বিদ্রূপহাস্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সে তাহার পাঁচ বৎসরের পুত্রকে কোলে চাপিয়া ধরিয়া চন্দ্রালোকিত গৃহকুট্টিমে বসিয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল।

[৬]

সন্ধ্যারতিব ঢাক বাজিয়াছে। গ্রামেব বালক যুবক বৃদ্ধগণ পোষাকী বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পূজা-বাড়ীতে মহামায়াকে প্রণাম করিতে যাইতেছে। আনন্দে উৎসাহে সকলেরই মুখ প্রফুল্ল; সপ্তমীর আধখানা চাঁদ সুধাময় হাস্যে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে; সমস্ত প্রকৃতি যেন মনের আনন্দে হাসিতেছে। রজনীগন্ধা, কদম্ব ও চম্পকের সৌরভরাশি বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে, যেন তাহা শারদ লক্ষ্মীর সুরভিত নিশ্বাস। পূজা বাড়িতে আলোকমালার কি উজ্জ্বল শোভা! মায়ের সোনালী সাজে, তাঁহার সুপ্রশান্ত প্রফুল্ল আননে চণ্ডীমণ্ডপস্থিত শতদীপরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের নয়ন মন বিমুগ্ধ করিতেছে। পূজামণ্ডপে লোকের ভীড়ে বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। ধূপধূনার সৌরভে পূজামণ্ডপ পূর্ণ। সকলেই কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দশভূজার মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে। পুরোহিত মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চপ্রদীপ আন্দোলিত করিয়া মায়ের আরতি করিতেছেন, আর যোলটা ঢাক পাখা দুলাইয়া নাচিয়া-নাচিয়া সমতালে বাজিতেছে। —উৎসব-ভবন আনন্দে পূর্ণ।

আরতি শেষ হইল; ঢাকের বাদ্য থামিয়া গেল; দর্শকমণ্ডলী মাতৃচরণে প্রণত হইয়া ধীরে ধীরে পূজামণ্ডপ পরিত্যাগ করিল। ভীড় কমিতে দেখিয়া গৃহলক্ষ্মীরা মাতৃচরণ দর্শনাশায় স্পন্দিতবক্ষে সসঙ্কোচে একে একে দামোদরের পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। দামোদরের আদরিণী গৃহিণী কনকলতা মণ্ডপের একপ্রান্তে আড়ালে দাঁড়াইয়া পরিচিতা গ্রামবাসিনীগণের অভ্যর্থনা করিল; তাহার কণ্ঠবিলম্বিত কারুকার্য্যখচিত মূল্যবান 'পুষ্পহারে' দীপরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ঝলমল্ করিতে লাগিল; তাহার মনোহর কর্ণভূষায় যেন বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। ভাগ্যবতীর মনে হইল, আজ তাহার জীবন সার্থক।

ঝাড়লণ্ঠনভূষিত 'টাপোরে'র নীচে জনসমাগম বিরল হইয়া আসিলে, দামোদর তাহার তিন বৎসরবয়স্ক পুত্রের হাত ধরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সোপানশ্রেণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মপ্রসাদে তাহার হৃদয় পূর্ণ ; সে নির্ণিমেষ নেত্রে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল ; প্রৌঢ়ার সঙ্গে একটি পাঁচ বৎসরের বালক। বালকের পায়ে ছেঁড়া জুতা, গায়ে একটা ময়লা জামা ; সে কৌতূহলবিস্ফারিত নেত্রে ঠাকুর দেখিতে লাগিল।—এই বালক শৈলবালার গর্ভজাত সন্তান, দামোদরের পুত্র নৃত্যলাল !—সে মামার বাড়ীর পুরাতন ঝি বামার সঙ্গে ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছে। শৈলবালা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

বামা দামোদরকে পার্শ্বে দণ্ডয়ামান দেখিয়া তাহার সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না ; ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "প্রেণাম হই জামাই বাবু, ভাল আছেন ত ? আমাদের ওদিকে যে পায়ের ধুলো দিলেন না ? পুরোনো সম্বন্ধ কি একেবারেই ভুল্‌তে হয় ? আহা, দিদিমণি আমার দিবেরাত্তির চোখের জলে ভাস্‌চে। সংসারে কি ভগবানের 'বিচের' নেই ? বাবা 'নেত্যলাল', তোমার বাপ্‌কে পেন্নাম কর, ইনি তোমার বাপ ! তা কি করেই বা চিন্‌বে ?"

শৈলবালার পুত্র নৃত্য ক্ষণকাল বিস্মিতভাবে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর পিতার পদতলে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিল।

বামা আসিয়া এখানে এ ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে, দামোদর ইহা পূর্ব্বে কল্পনাও করে নাই। পুত্রকে তাহার চরণে প্রণত হইতে দেখিয়া অপ্রস্তুতভাবে কয়েকপদ সবিয়া দাঁড়াইল এবং "আমি একা মানুষ, বড় ব্যস্ত,"—এইরূপ দুই একটি কথা বলিয়াই মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে দ্বিতীয় পক্ষের নন্দনের হাত ধরিয়া সরিয়া পড়িল। বাবা একটা কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না দেখিয়া বালক নৃত্যলাল মনে বড বেদনা পাইল ; তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। বামা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

দামোদরের পুত্র উনীনাথ বলিল, "বাবা, ও ছেলেটা কার ছেলে ?"

দামোদর অনামনস্কভাবে বলিল, "ও কোন্ ভিখারীর ছেলে হবে।"

দীর্ঘকালপরে নৃত্যলালের মুখ দেখিয়া দামোদরের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইল। যতই কঠিন-হৃদয় হউক—সে মানুষ, তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। রাত্রে সে কথাপ্রসঙ্গে তাহার দ্বিতীয় পক্ষকে জানাইল, নৃত্যলাল ঠাকুর দেখিতে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়াছে। তাহাকে একবার কোলে লইতে তাহার ইচ্ছা হইযাছিল। আহা, ছেলেটার গায়ে একটা ভাল জামা

নাই, ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়া সে ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছিল।

দামোদরের এই সমবেদনাপূর্ণ কথা শুনিয়া দামোদরের দ্বিতীয় পক্ষ কনকলতা চামুণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করিল,—ক্রোধভরে বলিল, "কে তাকে জামা জুতা দিতে বারণ করেছে !" তা নিয়ে এস না কেন, তোমার সেই শৈলবালাকে ! আমি যদি এত চোখের বিষ হয়ে থাকি ত দাও না আমাকে বাপের বাড়ী বিদেয় করে ! জানি তোমার ষোল আনা টান সেই তোত্‌লা কালা খুঁড়ির দিকে, কেবল চক্ষুলজ্জায় আমাকে ঘরে রেখেছে বৈ ত নয় ! ভাগ্যে বাবাকে শ্বশুর পেয়েছিলে, তাই দু'পয়সা রোজগার করে খাচ্ছ; এখন আমাকে মনে লাগ্‌বে কেন ? 'নেমকহারাম' মানুষের স্বভাবই এই রকম !" গৃহিণী অভিমানভরে শয্যা গ্রহণ করিল। তাহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইতে লাগল ;—দামোদর জগৎ অন্ধকার দেখিল, পত্নীর অভিমান ভঙ্গ করিতে তাহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। দামোদর প্রতিজ্ঞা করিল ;—সে আর শৈলবালা বা তাহার পুত্রের কথা মুখেও আনিবে না। অভিমানভঙ্গে কনকলতা অষ্টমীপূজার আয়োজন করিতে বসিল।

সপ্তমীর নিশি প্রভাত হইল।

[৭]

দশমীর দিন অপরাহ্ণে দামোদরের পূজা-মণ্ডপে মহামায়ার 'বরণ' আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকের বাদ্যে আর সে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে না, তাহাতে যেন বিষাদের হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে। সানাই সুর করিয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বিদায়-গাথা গান করিতেছে : তাহার সুরের প্রতিকম্পনে আসন্ন বিরহের করুণ বেদনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা পুরাঙ্গনাগণ মাকে বরণ করিতে আসিয়াছেন ; সংবৎসরের মত তাঁহাকে বিদায় দান করিতে সকলেরই চক্ষু ছলছল করিতেছে।—সর্ব্বাগ্রে বহুমূল্য বারাণসী-শাড়ী-বিমণ্ডিতা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা কনকলতা বরণডালা মস্তকে লইয়া বরণে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্বাগ্রে তাহারই বরণের অধিকার ; অন্যান্য রমণীগণ অদূরে দাঁড়াইয়া গৃহিণীর বরণ-শেষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় একটি সধবা রমণী ধীরে ধীরে পূজার দালানে উঠিয়া, মাতৃ মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণী যেন বিষাদের প্রতিমা। তাহার পরিধানে একখানি মলিন বস্ত্র ; আভরণের মধ্যে দুই হাতে দুই গাছি কাচের চুড়ি ; তাহার কেশ রুক্ষ, চক্ষু দুটি অশ্রুভারে অবরুদ্ধ।

রমণী দেবীর চরণে লুটাইয়া পড়িল, অশ্রুরুদ্ধনেত্রে মায়ের স্বর্ণ-শোভিত

প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, তুই স্বামীর ঘরে চলিলি, আমার স্বামীর ঘরে আমার স্থান নাই ! আমি কোথায় যাব মা ? আমাকে তোর চরণে স্থান দে, আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাক।"

শৈলবালা আর কোনও কথা বলিতে পারিল না ; সে মাতৃচরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

বরণে হঠাৎ বাধা পড়িল ; কনকলতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, সক্রোধে বলিল, "এ আপদ এখানে কেন মরিতে আসিল !" আকস্মিক বিভ্রাটে ঢাকের বাদ্যও থামিয়া গেল ; সানাইয়ের কণ্ঠরোধ হইল ! —কেবল পশ্চিম গগন হইতে শ্রান্ত তপনের লোহিত রশ্মিজাল বাতায়নপথে মায়ের হরিতাল-রঞ্জিত অতসীবর্ণাভ মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার প্রশান্ত মুখকান্তিকে করুণার উৎসাধারায় সিক্ত করিল ; মনে হইল, নিরাশ্রয়া অভাগিনী কন্যার দুঃখে মা ত্রিনয়নীর নেত্রত্রয় হইতে অশ্রুরাশি প্রবাহিত হইতেছে।

তৃতীয় স্তবক

প্রত্যাখ্যান

[১]

নটবর দত্তের অনেকগুলি ছেলে মেয়ে শৈশবে নষ্ট হইবার পর, একটি মেয়ে হইল দেখিয়া, মা বাপ তাহার নাম রাখিয়াছিল, হারাণী।

নটবর জাতিতে গন্ধবণিক, সে অশিক্ষিত মূর্খ লোক, কিন্তু ধর্ম্মভীরু। পদ্মার তীরবর্ত্তী বাউসমারী-নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাহার বাড়ী। পদ্মা পূর্ব্বে বাউসমারী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে ছিল, কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসরের 'ভাঙ্গনে' পদ্মা বাউসমারী গ্রামের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত বাহুবিস্তার করিয়াছে। বাউসমারীর থানাটি 'যায় যায়' হইয়াছে। এখন গ্রামের বাজারে দাঁড়াইয়া বর্ষার তরঙ্গভঙ্গময়ী পদ্মার অশ্রান্ত কলগীত শুনিতে পাওয়া যায়; মেঘ ও রৌদ্রের বিচিত্রলীলা তাহার আতটপূর্ণ বিশালবক্ষে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। বাউসমারীর বাজারের পার্শ্বে সাহাবাবুদের সুবৃহৎ আমবাগানের পরেই পদ্মার 'পাউড়ি'।

বাউসমারীর বাজারে নটবরের একখানি ক্ষুদ্র মশলার দোকান ছিল; দোকানখানি ক্ষুদ্র হইলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ; চারিচালা খ'ড়ো দোকান, দোকানের তিনদিকে ঝাঁপের বেড়া, সম্মুখে তিনখানি ঝাঁপের দুয়ার। ঝাঁপের মাচার উপর ছোট ছোট ডালায় নানাপ্রকার বেনে-মশলা স্তূপাকারে সজ্জিত। দোকান-ঘরের একপাশে বাঁশের আড়ায় কতকগুলি চটের ঝোলা, প্রত্যেক ঝোলার ভিতর এক এক রকম গাছ গাছড়া, ফল মূল কন্দ; কোনটিতে ক্ষেতপাপ্‌ড়ি, কোনটিতে 'কন্টিকেয়ারী', কোনটিতে অনন্তমূল, বৃহতী, সোনামুখী, রক্তচন্দন, পিপুল প্রভৃতি বনৌষধী। গ্রাম্য কবিরাজ মহাশয়গণের যে সকল 'বকালে'র নিত্য প্রয়োজন, তাহা নটবরের দোকান ভিন্ন বাউসমারীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বিশখানি গ্রামের মধ্যে আর কোথাও পাইবার উপায় ছিল না। এতদ্ভিন্ন চাউল, ডাল, তেল, গুড়, লবণ, মরিচ প্রভৃতি হইতে হাওয়ার্ডের কুইনাইন, এডোয়ার্ডের টনিক, কে স্নি বোসের সিংহ মার্কা বিস্কুট, সোডা, নীলবড়ি, কাপড়-কাচা সাবান—সকল সামগ্রীই নটবরের দোকানে পাওয়া যাইত; সে যেন একটি ক্ষুদ্র 'মিউজিয়ম'! নটবর যে সামগ্রী নাই বলিত, তাহা সোনার টাকা দিয়াও সে অঞ্চলে কেহ মিলাইতে পারিত না।

সুতরাং বলাই বাহুল্য, গ্রামে নটবরের কারবার বেশ চলিতেছিল। সংসারে

পরিবারের মধ্যে স্ত্রী পাতানী, কন্যা হারাণী ও গোয়াল-কাড়ুনী ফ্যালানী নাম্নী বিধবা গোপকন্যা ; এতদ্ভিন্ন নটবরের দূর সম্পর্কীয় শ্যালক জটাধারী তাহার গৃহে প্রতিপালিত হইয়া কখনও দোকানে বসিয়া 'বেচা কেনা' করিত, কখনও গোরুর বিচালী কাটিত, কখনও নিত্যানন্দ পোদ্দারেব দোকানে ইয়ারগণের সহিত তাস খেলিত ; এবং যেদিন হাতে কোনও কাজ না থাকিত, সেদিন দোকান-ঘরের বাঁশের মাচায় ছারপোকা-পূর্ণ ছেঁড়া 'ক্যাঁচকেচে'র পাটিখানি বিছাইয়া একটি তৈলপক্ক বিবর্ণ ছোট বালিশ মাথায় দিয়া নাক ডাকইয়া ঘুমাইত ; আর তাহার অদূরে একটা দড়ির মোড়ায় বসিয়া দশমবর্ষীয়া হারাণী বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগখানি খুলিয়া 'বড়গাছ' 'ছোটপাতা' 'লালফুল' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর পাঠ মুখস্থ করিত ; সে কোনটা বুঝিতে না পারিলে জটাধাবীকে ডাকিত, "ও মামা ! ঘুমুলে ? এটা কি— বলে দাও না !" জটাধারী বিরক্ত হইয়া বলিত, "যা যা, আর 'নেকা পড়া' শিখ্‌তে হবে না ! পড়বি কোন দোকানদারের ঘরে, 'তোর ছোট পাতা' 'লালফুলে' দরকার কি ? হারাণী নোলক নাড়িয়া গর্জ্জন করিয়া বলিত, "যাও মামা, তুমি বড় দুষ্টু, বাবাকে বলে দিয়ে তোমাকে মজা দেখাবো !"—কোনও কোনও দিন কেবলমাত্র মৌখিক ভয়-প্রদর্শনে সন্তুষ্ট না হইয়া সে জটাধারীর পিঠে চিম্‌টি কাটিত, না হয় খোঁপা হইতে লোহার কাঁটা খুলিয়া লইয়া তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দিত । আবার কখনও জটাধারী সুখ-সুপ্তির ব্যাঘাতে জীর্ণ বালিসের উপর হইতে সবেগে মাথা তুলিয়া "দাঁড়াতো, লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে !" বলিয়া বীরদর্প প্রকাশ করিবামাত্র হারাণী খিল-খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে দোকান হইতে পলায়ন করিত । হারাণীর দশম বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল ।

[২]

হারাণীর সমবয়স্কা সহচরীগণের প্রায় সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল । তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি ভদ্রলোকের কন্যা একজনও ছিল না ; কেহ গোপকন্যা, কেহ মুদীর মেয়ে, কেহ বা স্বর্ণকার-দুহিতা । তাহাদের কাহারও সাত, কাহারও আট, কাহারও বা নয় বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল । বাউসমারী চাষী-প্রধান গ্রাম, শিক্ষিত লোক সেখানে নাই । হারাণীর বয়স দশবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । এত বড় 'গেছো মেয়ে'র এখনও বিবাহ হয় নাই বলিয়া হারাণীর মা পাতানীর প্রতিবেশিনীগণ বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল । দুশ্চিন্তায় তাহাদের মুখে অন্ন রুচিত না, এবং এত বড় 'ধেড়ে' মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে রাখিয়া

পাতানী ও তাহার স্বামী নটবর কোন্ আক্কেলে নিদ্রা যায়, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া দুশ্চিন্তায় তাহারা দিন দিন কাহিল হইতে লাগিল। কিন্তু সেজন্য নটবরের সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না ; তবে প্রতিবাসীদের টিট্‌কারীতে বিব্রত হইয়া পাতানী এক একদিন কড়া কথা শুনাইয়া দিত। নটবর বলিত, "আহা, তুমি যে মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে' আমাকে বাড়ী-ছাড়া কর্‌বার যোগাড় করে তুল্লে !—আমার পাঁচ নয় সাত নয়, ঐ একটি মেয়ে ; ওকে আমি চোখের আড়াল কর্‌তে পারিনে, বিয়ে দিলেই ত ওকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে ; ওকে ছেড়ে আমি কি করে থাকবো ?—আরও এক আধ বছর যাক্ না, এত তাড়াতাড়ি কি ?" পাতানী তাহার স্বামীকে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বিরক্ত করিত। শেষে একদিন বলিল, "হারাণীর জন্যে একটা পাত্র দেখ, আর দেরী করা হবে না, আস্‌ছে অঘ্রাণেই ওর বিয়ে দেব। ওর বয়সী সকলেরই বিয়ে হয়ে গেল ; আমার হারাণীর হাতে পায়ে জল আছে, দশ বছরেই 'ডাগর' হয়ে উঠেছে ; শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে—এখনই ওকে তের চৌদ্দ বছরের মত দেখায় ! তুমি 'পাত্তর' দেখ।"

নটবর দোকানদার মানুষ, বিলাসিতার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। পল্লীগ্রামে অনাবশ্যক ব্যয়ের দৌরাত্ম্য নাই। সুতরাং দোকানে মাসে যে দশটাকা বিক্রয় হইত, তাহাতে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ও মহাজনের দেনা শোধ করিয়া সে কিছু-কিছু সঞ্চয় করিতে পারিত। পল্লীগ্রামে শীতকালে অগ্নিভয় বড় প্রবল হইয়া থাকে। প্রায় প্রতি বৎসরই বাউসমারীর কোন-না-কোন পাড়ায় বৈশ্বানরের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইত। আবার লোকগুলি এমন অদূরদর্শী ও স্বার্থপর যে, কোনও বাড়ীতে আগুন লাগিলে তাহারা নিজের-নিজের ঘর বাঁচাইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিত ; যাহার বাড়ী আগুন লাগিত, দল বাঁধিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিত না। ইহাতে এই ফল হইত যে, যে পাড়ায় আগুন লাগিত, সে পাড়ার প্রায় কাহারও ঘর হুতাশনের সর্ব্বগ্রাসী কবল হইতে রক্ষা পাইত না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নটবর মনে করিয়াছিল, সে যে হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা খরচ করিয়া দোকান ঘরখানি পাকা করিবে ; বাড়ীর ভাগ্যে যাহা হয় হইবে। দোকানঘরখানি কোনও রকমে বাঁচাইতে পারিলে মহাজনের মালগুলি রক্ষা পায়, দেনার দায়ে 'ফেরার' হইবার ভয় থাকে না। বাউসমারীর বাজারের দুই চারিজন মাতব্বর দোকানদার—কুঞ্জ সাহা, হারাধন কুণ্ডু, নিতাই পোদ্দার, বাঞ্ছারাম দে ও ভজহরি প্রামাণিক দোকানঘরগুলি অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য টিন দিয়া ছাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু পুরাতন টিনের কোনও মূল্য নাই ; টিনের ঘর করিয়া পয়সা নষ্ট করিবার নটবরের আগ্রহ ছিল না। দোকানটিকে পাকা করাই তাহার

বহুদিনের উচ্চাভিলাষ। এই জন্যই সে অতিকষ্টে দীর্ঘকালে হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল।

[৩]

মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর। নটবর দোকানঘর পাকা করিবে বলিয়া অতিকষ্টে যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, সে টাকা ব্যয় না করিলে কন্যাব বিবাহ হয় না! রহিয়া-বসিয়া সুবিধামত দোকানঘর পাকা করিলেও চলে, না করিলেও লোকের কোন কথা শুনতে হয় না; কিন্তু কন্যার বিবাহ বড গুরুতর সমস্যা! নিজের আর্থিক সচ্ছলতা বা সুযোগের উপর তাহা নির্ভর করে না; দুই বৎসর পরে যাহা হয় করা যাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। শুভ অগ্রহায়ণে হারাণীর বিবাহ না দিলেই নয়!

নটবরের পিতৃবন্ধু কাপড়-বিক্রেতা দে মহাশয় পরামর্শ দিলেন,—"বিশ পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিয়া কোনও দোকানদাবের ছেলের সঙ্গে হারাণীর বিবাহ দাও, ভাত কাপড়ের কষ্ট না হ'লেই হল। 'চাকুরে' কুটুম্বের কাছেও যাইও না! তাহাদের হাঁক বড় বেশী, সাম্‌লাইতে পারিবে না। তাহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের মত পাশ করা ছেলে নীলাম করিতেছে।"

নটবর বলিল, "মশায় যা বল্‌তেছেন তা অতি 'লেহ্য' কথাই বটে, তবে কি না আমার হারাণী পরীর মত সুন্দরী, সে যে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ঘর নিকোবে, বাসন মাজবে, নদী থেকে কলসী-কলসী জল আন্‌বে, এ আমার সহ্য হবে না। তা আমার যদি দশ টাকা খরচ হয়, তাতেও রাজী।"

দে মহাশয় বলিলেন, "বাপু হে, বুঝে-সুঝে কাজ করো, শেষে পস্তিও না, আম ছালা দুইই না যায়।—দোকানদার মানুষের অত উঁচু নজর ভাল নয়।"

নটবর গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। পাতানী বলিল," সে বুড়োর কথা শুনো না; আমার হারাণী কি দোকানদারের 'যুগ্যি'? হারাণীকে দেখ্‌লে কত চাকুরে তাকে সেধে নিয়ে যাবে। তুমি রামপুরের সেই ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ কর না।"

'রামপুরে' অর্থাৎ বাজসাহী জেলার সদরে গোবিন্দচন্দ্র পালের বাস, তিনি স্বরূপনগরের জমীদারের কাবকুণের কাজ করিতেন। জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি জমীদার সরকারে চাকরী করিতেছেন, এ জন্য অশিক্ষিত স্বজাতীয় দোকানদারগণ তাঁহার বড় খাতির করিত; গোবিন্দচন্দ্রের মনেও এজন্য কিঞ্চিৎ অহঙ্কার ছিল। তিনি যখন তখন বলিতেন, "আমি দাঁড়ি-ধরা বেনে

নই।"—গোবিন্দচন্দ্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন দাঁড়ি ধরিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহে যে গৌরব,—পরের দাসত্বে তাহা নাই।

গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র নিতাইচন্দ্র পাল এন্ট্রেন্স ফেল করিয়া নাটোরের আদালতে নকলনবিশী করিত। নিতাইচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গ পণ হইয়াছিল,—কালো মেয়ে সে বিবাহ করিবে না। নিতাইচন্দ্রের পিসী একবাব কুটুম্বিতা উপলক্ষে বাউসমারী আসিয়া হারাণীকে দেখিয়াছিলেন।

নটবর তাহার মামাতো ভাই দুর্গতি দত্তকে দিয়া গোবিন্দচন্দ্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল।

[৪]

গোবিন্দ কয়েকদিনের জন্য ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। দুর্গতি দত্ত একদিন প্রভাতে একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া, ছেঁড়া চটী জোড়াটা পায়ে দিয়া, এবং ময়লা চাদরখানি গলায় ঝুলাইয়া গোবিন্দ পালের গৃহে যাত্রা করিল। গোবিন্দ তখন খোলা গায়ে জলচৌকীর উপর বসিয়া দাঁতন করিতেছিলেন; পদ্মাবক্ষ-প্রবাহিত মুক্ত সমীরণ প্রবাহ তাঁহাব কদলী-বাগানস্থিত কদলীপত্রে লাগিয়া সর-সর শব্দ করিতেছিল, এবং একটা শঙ্খচিল পথিপ্রান্তস্থ উচ্চতাল গাছের মাথায় বসিয়া প্রথম হেমন্তের প্রভাতে নবীন সূর্য্যেব কিরণধারায় শিশির-শীতল দেহ উত্তপ্ত করিতেছিল। শঙ্খচিলটা "চিঁ-ই-ই" শব্দে ডাকিয়া উঠিল।

দুর্গতি দত্ত মাথা তুলিয়াই শঙ্খচিলটাকে দেখিতে পাইল, সে বড় সুখী হইল, বুঝিল, যখন শঙ্খচিল দর্শন হইল—তখন নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া শঙ্খচিলকে নমস্কার করিল।

দুর্গতি দত্তকে গোবিন্দ পাল চিনিতেন; হাজার হউক স্বজাতি ত! তবে তিনি জানিতেন, হাতী ও ব্যাঙে যত তফাৎ—তাহাতে ও দুর্গতি দত্তের মত দোকানদারে সেই পরিমাণ তফাৎ! তিনি হইলেন, মহামহিমান্বিত জমীদার শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত ভড় রায় বাহাদুরের সদরের কারকুণ, মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, এবং উপরি-প্রাপ্তি সালিয়ানা বারোসিকা তিন শত টাকা! মশলাবিক্রেতা দুর্গতি দত্ত তাঁহার নিকট 'কলিকা' পাঠাইবার যোগ্য নহে। তথাপি হাতী যে ভাবে মশাকে নিরীক্ষণ করে, বিশালবপু গোবিন্দ পাল সেই ভাবে দুর্গতি দত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে! এত সকালে কি মনে করে? আমার কাছে, কোনও দরবার আছে না কি? ঐ যে, মোড়াটার উপর বোস'।"

অদূরে একটি ছিন্ন মোড়া পড়িয়াছিল। মোড়াটি পূর্ব্বে দড়ি দিয়া ছাওয়া ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল মানুষের ভারবহনে জীর্ণ হইয়া দড়ির ছাউনি অনেক দিন পূর্ব্বেই 'পেন্সন' লইয়াছিল, মধুর অভাবে গুড়ের ন্যায় একখানি ছিন্ন শতরঞ্চের কিয়দংশ তাহার 'একটিনি' করিতেছিল ! দুর্গতি দত্ত সেই মোড়ার উপর বসিয়া দুই একবাব কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আমার দাদা বাউসমারীর নটবর দত্তকে বোধ হয় মহাশয় জানেন। সে অঞ্চলে এত বড় মশলার দোকান আর কারও নাই।"

পালজী দাঁতনটিকে স্বকার্য্যসাধনে বিরত করিয়া উদাসীন ভাবে বলিলেন, "তা, হবে, নটবর দত্ত কি আমাদের জমীদারীর প্রজা ? তার কোনও দরবার আছে না কি ?"

দুর্গতি দত্ত ভয়ে ভয়ে বলিল, "এক রকম দরবার বৈ কি কর্ত্তা ! আপনি হচ্ছেন আমাদের সমাজের মধ্যে একজন 'প্রেধান' ব্যক্তি।—নটবর দাদার একটি মেয়ে আছে. পরমা সুন্দরী ; শুনেছি আপনি নিতাইবাবুর জন্য একটি ভাল পাত্রী খোঁজ করচেন, তাই সেই কথা জানতে এসেছি।"

গোবিন্দ পাল মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ওঃ—ঘটকালি করতে এসেছ !—তা এ বেশ কথা। মেয়ে পছন্দ হলে আমি বিয়ে দিতে পারি,—কিন্তু আজকাল ভদ্রসমাজে দেনাপাওনার যে রকম 'রেওয়াজ' হয়েছে, তা জান ত ?—নটবর কি ততটা পারবে ?"

দুর্গতি দত্ত বলিল, "সে কথা আমি দাদাকে লিখি।"

পালজি বলিলেন, "তা লেখ, কিন্তু এ দুশো পাঁচশোর কর্ম্ম নয় ; আর নিতাই যদি মেয়ে 'পছন্দ' করে, তবেই এ কাজ হতে পারে। এ কালের লেখাপড়া জানা ছেলে, তার উপর আবার চাকরী-বাকরী করছে। তারা স্বাধীন ; তাদের পছন্দ-অপছন্দের উপর আমার কথা চলবে না।"

[৫]

নিতাই মুন্সেফী আদালতে, কি ফৌজদারী আদালতে, নকলনবিশী করিত ; কিন্তু চশ্‌মা না হইলে সে দেখিতে পাইত না, সম্মুখে বড় ও পিছন দিকে ছোট করিয়া চুল ছাঁটিত, গোরা মিস্ত্রীর জুতা ভিন্ন দেশী জুতা তাহার পায়ে উঠিত না, এবং এসেন্স ভিন্ন তাহার একদিনও চলিত না। নিতাই নকলনবিশীতে কোনও মাসে ১৮৸৵ কোনও মাসে ২১।৵ , কোনও মাসে পুরা ২২৲ টাকা উপার্জ্জন করিত ; বাড়ীতে এক পয়সাও দিতে হইত না, কাজেই বিলাসিতার জন্য তাহার

অর্থাভাব ঘটিত না।

নিতাই জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়া দুই বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পদ্মা পার হইল, বাউসমারী অধিক দূর নহে, সে গোপনে একাদশবর্ষীয়া হারাণীকে দেখিয়া আসিল, পছন্দও হইল।

তখন উভয় পক্ষে দরদস্তুর চলিতে লাগিল। বিস্তর বাদানুবাদের পর স্থির হইল,—নটবর জামাতাকে সোনার ঘড়ী, চেন, অঙ্গুরী ও সোনাব এক সেট বোতামের নগদ মূল্য—সর্ব্বসমেত তিন শত টাকা অগ্রিম দিবে ; আর মেয়েকে হাজার টাকার গহনা দিবে।

গোবিন্দ পাল বলিলেন, "রামপুরে ভাল ভাল 'জুয়েলারী ও পোদ্দারী' দোকান আছে ; আমি সোনা কিনিয়া পছন্দ মত গহনা গড়িয়া লইব।"

নটবর বলিল, "আমি গহনা প্রস্তুত করাইয়া দিব।"

গোবিন্দ পাল বলিলেন, "সব গহনা কিন্তু গিনি সোনার হওয়া চাই। আমি যাচাই করিয়া লইব।"

নটবর অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইল।—আর দিন নাই।

নটবর দোকান পাকা করিবার জন্য যে হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা হইতে বরাভরণের তিন শত টাকা ভাবী বৈবাহিকের হস্তে সমর্পণ করিল, এবং অবশিষ্ট সাত শত টাকায় কন্যার অলঙ্কার ও অন্যান্য ব্যয়, এমন কি, কুটুম্বদের পাকা ফলারের ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিবার সঙ্কল্প করিল ! হাজার টাকার গহনা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সে হারাণীকে পাঁচ শত টাকার অধিক মূল্যের অলঙ্কার দিতে পারিল না ; আর টাকা নাই।

বিবাহ-সভায় অলঙ্কারের অল্পতা দেখিয়া গোবিন্দ পাল ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন ; বলিলেন, এমন জোচ্চোরের মেয়ের সঙ্গে কখনও পুত্রের বিবাহ দিবেন না। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করিবার উপায় নাই ; গ্রামের 'ভদ্রলোকে'রা গোবিন্দ বাবুর হাত ধরিলেন, নটবর তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, নিজের অক্ষমতার কথা জানাইল।

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "ক্ষমতা নাই ত আমার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে গিয়াছিলে কেন ?—তোমার মত একটা দোকানদার-টারের ছেলে ধরিয়া বিবাহ দিলেই পারিতে ?"

বৃদ্ধ দে মহাশয় বলিলেন, "কেমন হে নটবর ! আমি সেই কালেই না তোমাকে বলিয়াছিলাম ?"—ইত্যাদি।"

কোনও প্রকারে সাত পাক শেষ হইল। গোবিন্দবাবু বরযাত্রীদের লইয়া

বাসায় প্রস্থান করিলেন। বরযাত্রীদের একটি প্রাণীও নটবরের গৃহে জলস্পর্শ করিল না। নটবর ও তাহার স্ত্রী অভুক্ত রহিল।

[৬]

পরদিন 'ব্যাণ্ড' ও 'ব্যাগ্‌পাইপ' বাজাইয়া গোবিন্দ পাল বর্‌কনে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। পাতানী তাহার রান্নাঘরের মেঝের উপর দুই পা ছড়াইয়া মেয়ের জন্য কাঁদিতে বসিল। এই এগার বৎসর সে একটি দিনের জন্যও স্নেহময়ী কন্যাকে চোখের আড়াল করে নাই। সোনার প্রতিমা পরের হাতে সঁপিয়া কি লইয়া সে সংসার করিবে? হারাণী তাহার বড় আদরিনী মেয়ে, বড় অভিমানিনী; অপরিচিত বৈবাহিক-পরিবারে কে তাহার মনের কষ্ট বুঝিবে? কে তাহার অভিমান দূর করিবে?"

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া হারাণী মা বাপের জন্য কাঁদিয়া-কাঁদিয়া চোখ ফুলাইল। জটাধারীর জন্য তাহার বড় মন কেমন করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গিনীদের ভালবাসা, অভিমান, আড়ি ও ভাব তাহার পুনঃপুনঃ মনে পড়িতে লাগিল; তাহার লাল চেলী চোখের জলে ভিজিয়া গেল।

নিতাইয়ের মা বউ দেখিয়া খুসী হইল, কিন্তু গহনা ও অন্যান্য দানসামগ্রী দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নটবর যদি কোনও অবস্থাপন্ন দোকানদার-পুত্রকে এরূপ সাধ্যাতীত যৌতুক সহ কন্যা সম্প্রদান করিত, তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইত; কারণ, সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল, বাউসমারীতে কোনও গন্ধবণিক ইতিপূর্ব্বে কন্যা-জামাতাকে এত অধিক যৌতুক প্রদান করে নাই। কিন্তু দোকানদার হইয়া লেখাপড়া-জানা চাকুরে জামাই জুটাইতে গিয়া তাহার তাঁতীকুল বৈষ্ণবকুল উভয়ই গেল! নটবর লেখাপড়ার উপর হাড়ে চটিয়া গেল! সে বলিল "মূর্খ দোকানদার ভাল; তাহারা কুটুম্বের সম্মান রাখিতে জানে।"

নিতাই-এর মা নাসা-বিলম্বিত মুক্তা-প্রবাল-খচিত নথচক্র আন্দোলিত করিয়া বিরক্তিভরে বলিল, "ওমা, দেওয়ার 'ছিরি' দেখ! এ দু'খানা 'রাঙ্‌ চাক্‌তি' না দিলেই ত হ'ত। দোকানদারগুলো এক পয়সার মা-বাপ, তারা আবার মেয়ে জামাইকে দিতে জানে!"

প্রতিবেশিনী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী কাহারও মুখের উপরে উচিত কথা বলিতে ছাড়িতেন না। তিনি বলিলেন, "তারা যেমন মানুষ, তেমনি দিয়েছে; মন্দই বা কি দিয়েছে? সর্ব্বস্ব ঢেলে দেয় নি বলে বৌকে অশ্রদ্ধা কর্‌বি? তুইও মেয়ের

বিয়ে দিয়েছিস ; কি ন'শো পঞ্চাশ দিয়েছিলি ? আজই যেন তোরা 'নেকাপড়া' শিখে চাকরে হয়েছিস্ , এক পুরুষ আগে কি তোরাও দাঁড়ি ধরিস নি ? আমার কাছে উচিত কথা।"

নিতাইয়ের মা রাগিয়া বলিল, "বৌর মা কি তোমাকে উকীল দিয়েছে না কি ? তোমরা বামুন কায়েতরা কশাইগিরি করচো, তাতে কথা নেই : যত দোষ আমাদের বেলা !"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বলিলেন, "তবে আর কি ? বৌর সঙ্গে যে মেয়েটা এসেছে তার গলায় ছুরি দে ! বেয়ান মাগীর ত আর দেখা পাবিনে। ছেলের বিয়েতে বামুন কায়েতরা কশাইগিরি করে বলে তোদের চোখ টাটাচ্ছে ! হা ভগবান, এ হতভাগা দেশে মেয়ের মা করে আমাদের সৃষ্টি কর কেন ?"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে প্রস্থান করিলেন। নিতাইয়ের মা তিন মাস তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করে নাই।

[৭]

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া হারাণী দেখিল, সে বড় কঠিন ঠাঁই ! শ্বাশুড়ী কথায় কথায় 'দোকানদারের বেটী' বলিয়া কটূক্তি করেন ; পান সাজিতে, বিছানা পাড়িতে একটু ত্রুটি হইলেই বিধবা ননদ মুখ ঝাপটা দিয়া বলে, "ধন্যি মেয়ে ! মা বাপ তোমাকে এত বড 'গেছো' করে রেখেছিল, কেবল কি বসে বসে খাইয়েছে ? কোনও কাজকর্ম্ম শেখায় নি ?" যে সকল দুঃস্থা প্রতিবেশিনী সময়ে অসময়ে গোবিন্দবাবুর স্ত্রীর নিকট বিনা সুদে টাকাটা সিকাটা কর্জ্জ লইবার আশায় আত্মীয়তা করিতে আসিত, তাহারা গৃহিণীর মনোরঞ্জনের জন্য মন্তব্য প্রকাশ করিত, "তা হোক সুন্দর, রূপ ত ধুয়ে খাবার জিনিস নয় ! এত বড় মেয়ে, ন'ড়ে বসে না ; দিবেরাত্রি কেবল কান্না !" গোবিন্দ-বণিতা ঝঙ্কার দিয়া বলিত, "তোমরাই পাঁচজনে দেখ দেখি, বৌর কত গুণ ! মুড়ি-মুড়কি খেলে পেট ব্যথা করে, রুই মাছের মুড়ো ছাড়া অন্য মাছ মুখে রোচে না। চক্ষু দুটি যেন শ্রাবণ মাসের মেঘ, ঝরচেই !—এমন কর্ম্মভোগেও পড়েছি বাপু ! যেমন কাজ ছিল না, তাই অজ পাড়াগেঁয়ের ঘরে ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে ছিলাম, জ্বালিয়ে মারলে !"—হারাণী দূরে বসিয়া সব শুনিত, আর অঞ্চলে চক্ষু মুছিত। তাহার সর্ব্বদা মনে হইত এই কারা-পিঞ্জর ভেদ করিয়া কত দিনে সে বাহির হইবে ! কিন্তু এই আশা ত্যাগ করিতে হইল। পল্লিবাসিনী প্রৌঢ়া কর্ম্মকার-কন্যা গদার মা কিঞ্চিৎ শিরোপার লোভে হারাণীর 'বডিগার্ড' হইয়া রামপুরে গিয়াছিল। ক্রমাগত

খোঁটা খাইয়া দুই চারিদিনেই যে বেচারার এমনই মন্দাগ্নি হইল যে, একদিন মধ্যাহ্নে কাহাকেও কিছু না বলিয়া অনাহারেই সে একখানি 'গহনার নৌকায়' উঠিয়া বাড়ি পলাইল ! হারাণীর শাশুড়ী পূর্ব্বেই রায় প্রকাশ করিয়াছিল, বৌমার এখন বাপের বাড়ী যাওয়া হইবে না। বৌমা একটুও সহবৎ শিখে নাই ; কাজ কর্ম্ম কিছুই জানে না। তাহাকে শাসনে না রাখিলে তাহার 'তবিবৎ দুরস্ত' হইবে না।

শীতকালে দরিদ্রের ছেঁড়া কাঁথার মত, বর্ষার দিনে তালপাতার ছাতার মত, গদার মা এই কয়দিন শ্বশুর বাড়ীতে তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। সে চলিয়া গেল। হারাণী মনের বেদনা প্রকাশ করিবে, এমন লোক তাহার শ্বশুরবাড়ীতে একটিও দেখিতে পাইল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া সে আর কাঁদিত না। এক এক সময় মা বাপের উপর তাহার বড় রাগ হইত, তাঁহারা কেন তাহাকে এমন করিয়া বনবাস দিলেন ?—সে কি তাঁহাদের এতই ভার হইয়াছিল ?

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শাশুড়ী যখন ঘরের মেজেতে আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইত এবং বিধবা ননদ পল্লী যুবতীদের লইয়া তাস খেলিতে বসিত, তখন হারাণী লুকাইয়া ছাদের উপর উঠিত, এবং নির্ণিমেষ নেত্রে পদ্মার পরপারবর্ত্তী অস্ফুট বনরেখার দিকে চাহিয়া থাকিত। সে জানিত, সেইদিকে তাহার বাপের বাড়ী।

গোবিন্দ পালের বাড়ী পদ্মার ধারেই অবস্থিত, নদী-মধ্যে প্রকাণ্ড বালুকাপূর্ণ চর, তাহার পর 'বহতা' নদী। শত শত নৌকা সাদা পাল উড়াইয়া নানা পণ্য দ্রব্য লইয়া বিদেশে ছুটিয়া চলিত, চরের বালি মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ঝিক-ঝিক করিত, বহুদূরে সবদহের কুঠীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাউ গাছগুলির মাথা আকাশের কোলে ধূসর ছায়ার মত দেখাইত, নদীর পরপারে চড়ার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত কৃষকপল্লীর পর্ণকুটীরগুলির দিকে চাহিয়া হারাণীর মনে হইত, ঐরূপ একখানি কুটীরে তাহার দুঃখিনী জননী ভাতের থালা সম্মুখে লইয়া তাহার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ! বাপের কাছে বসিয়া না খাইলে তাহার পেট ভরিত না ; বাবা এখন কাহাকে সঙ্গে লইয়া খাইতে বসিবেন ?—হারাণী চক্ষুর জলে চারিদিক ঝাপ্‌সা দেখিত।

একদিন সে ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে, হঠাৎ ননদের কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার ননদ মানদা ভ্রূকুটী-কুটিল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁলা বৌ, তোর আক্কেল কি ?—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস ! আর কি কেউ শ্বশুরঘর করে না ? না, তুই একাই শ্বশুরবাড়ী এসেছিস্ ? সকল মেয়েই মা বাপের আদরের, কিন্তু তোর মত বাড়াবাড়ি কেউ করে না।"

হারাণী চোখের জল মুছিয়া নামিয়া আসিল।

কয়েক দিন পরে হারাণী তাহার পিতাকে গোপনে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিল, "বাবা, আমাব এখানে মন টিক্‌চে না, আমাকে নিয়ে যাও।"

নটবর তাহাকে বৈশাখ মাসে লইয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া পত্র লিখিল।

পত্রখানি যথাকালে শাশুড়ীর হাতে পড়িল। পাল-গৃহিণী সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি বৌ মানুষ, তোমার হাত চেয়ে আম মোটা ! তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের নিন্দে করে বাপ্‌কে পত্র লেখ ? ফের যদি ওরকম নষ্টামী কর ত তোমার 'অদেষ্টে' বেস্তর 'দুঃখু' আছে।"

কন্যার পত্র না পাইয়া নটবর পুনঃপুনঃ তাহাকে কয়খানি পত্র লিখিল ; কিন্তু কোনও পত্র হারাণীর হস্তগত হইল না। বাপের বাড়ীর কোনও সংবাদ না পাইয়া মনেব কষ্টে হারাণী দিন দিন শুকাইতে লাগিল।

[৮]

বৈশাখ মাস আসিল।

নটবর কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য বৈবাহিককে পত্র লিখিল, একখানি, দুইখানি, ক্রমে তিনখানি পত্র লিখিবার পর জবাব পাইল, "বৌমাকে বাপের বাড়ীতে রাখিবার জন্য পুত্রেব বিবাহ দেই নাই ; সেই অসভ্য চাষা পাড়াগেঁয়ে তাহার এখন যাওয়া হইবে না ; ইচ্ছা হয়, এখানে আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া যাইতে পারহ।"

পত্র পড়িয়া নটবর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে এমন দয়া-মায়া-হীন রাক্ষসের ঘরে মেয়ে দিয়েছিলাম !" হারাণীর মা রান্নাঘরে ভাত চড়াইয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল ; শেষে স্থির করিল, "যেমন করে' পারি, পূজার সময় মেয়ে নিয়ে আস্‌বো। বিয়েব কনে ততদিনেও কি পাঠাবে না ?"

ক্রমে আশ্বিন মাস আসিল। প্রতিবেশিনী হারুর পিসী রামপুরে হারুর কাছে যাইতেছিল. পাতানী তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল. "হারাণীকে বলো, আমি পুজোর সময় তাকে নিয়ে আস্‌বো, সে যেন কাঁদাকাটি না করে।"

হারুর পিসীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া হারাণী দিন গণিতে লাগিল।

বোধন বসিল। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী গেল, হারাণীকে কেহ লইতে আসিল না ! গোবিন্দের বাড়ীর অদূরে ষ্টীমার ঘাট। দামুকদিয়ার ষ্টীমার প্রত্যহ রামপুরে আসে। পূজার সময় মালের বাহুল্যে ষ্টীমার আসিবার নিয়ম নাই ; কখনও প্রভাতে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষ্টীমার আসে। ষ্টীমারের বাঁশী

শুনিলেই হারাণী ছাদে গিয়া দাঁড়ায় ; দেখে ষ্টীমার-ঘাটে লোকারণ্য ! কত দেশ-বিদেশের যাত্রী মুটের মাথায় মোট দিয়া ষ্টীমার হইতে নামিয়া যাইতেছে ; বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই উৎসাহ ! মনের আনন্দ সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে । কিন্তু সেই আরোহীগণের মধ্যে হারাণী একখানিও পরিচিত মুখ দেখিতে পায় না ! সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছলছল নেত্রে ছাদ হইতে নামিয়া আসে । রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষ্টীমারের বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় ; সে বিছানায় উঠিয়া বসে, মনে করে, "বাবা এই ষ্টীমারে আসিতেছেন !"—বসিয়া-বসিয়া কাহারও কোনও সাড়া না পাইয়া আবার সে শুইয়া পড়ে, চক্ষুর জলে বালিশ ভিজিয়া যায় ; কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ঘুম আসিলে সে স্বপ্নে শুনিতে পায়, বাবা যেন মাথার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "হারাণী, মা, আমি এসেছি , আর কাঁদিসনে !" হারাণী চক্ষু খুলিয়া দেখে, ঘর অন্ধকার, বাড়ী নিস্তব্ধ, কেহ কোথাও নাই ! হারাণী মনে করে এ স্বপ্ন কেন ভাঙ্গিল !—হারাণীর কণ্ঠের হাড় বাহির হইল, সোনার অঙ্গে কালী পড়িল । হারাণী ভাবিতে লাগিল, "বাবা কি আমাকে ভুলিয়া গেলেন ? মা'রও কি আমাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না ?"

[৯]

কথা এই যে, নটবর জ্বরে পড়িয়াছিল । চতুর্থীর দিন অন্ন পথ্য করিয়া পঞ্চমীর দিন বেলা দশটার সময় বাউসমারীর দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী আলাইপুর ষ্টেশনে সে ষ্টীমার ধরিল । এই দুই ক্রোশও তাহাকে গরুর গাড়ীতে আসিতে হইয়াছিল ! দেহে বল নাই, দুই পা চলিতেও মাথা ঘুরিয়া উঠে ; লাঠী ধরিয়া সে অতি কষ্টে 'লার্ক' ষ্টীমারে উঠিয়া চাদরখানি পাতিয়া ডেকের এক পাশে বসিয়া পড়িল । যাত্রী নামাইয়া ও নূতন যাত্রী তুলিয়া লইয়া, 'লার্ক' হুস্‌-হুস্‌ শব্দে কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া ও পদ্মার তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া রামপুরের অভিমুখে উজানে চলিল ।

ষ্টীমারের উপরে যাত্রী হট্টগোল । নানা স্থানে এক একটা দল ; কোথাও গান হইতেছে ; কোথাও গল্প চলিতেছে, হাসির 'হর্‌রা' উঠিতেছে ; কোথাও চারিজন যাত্রী সতরঞ্চি পাতিয়া তাস খেলিতে বসিয়াছে, দর্শকবৃন্দ চারিদিকে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে ।—নটবর তাহাদের মধ্যে নিতান্ত একাকী ; সে ষ্টীমারের একপাশে বসিয়া সুদূর প্রসারিত জলরাশির দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছে,—"কখন ষ্টীমার রামপুরে পৌঁছিবে, কখন হারাণীকে দেখিতে পাইব ?

আহা, আজ যে দশ মাস তাহাকে দেখি নাই ! বাছা আমার কেমন আছে ? এতদিন পরেও কি বেযান তাকে আমার সঙ্গে পাঠাইবে না ?"

বেলা তিনটার সময় রামপুরের নীচে আসিয়া ষ্টীমারের বাঁশী বাজিল। "বাবা কি আজও আস্‌বেন না ?"—বলিয়া হারাণী তাড়াতাড়ি ছাদে উঠিল, কতক্ষণ পরে ষ্টীমার জেটিতে ভিড়িল ! যাত্রীরা ঠেলাঠেলি করিয়া নামিতে লাগিল ; হারাণী দেখিল, সকল যাত্রী নামিলে নটবর একটি কাপড়ের 'পুঁটুলি' হাতে লইয়া লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। পিতার রুগ্ন দুর্ব্বল দেহ ও মলিন মুখ দেখিয়া হারাণী ক্ষণকাল অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার পর চক্ষু মুছিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া শাশুড়ীকে বলিল, "বাবা আসচেন !"—তেমন উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠস্বর সে বাড়ীতে আর কখনও ধ্বনিত হয় নাই।

গোবিন্দ পূজার ছুটিতে দুইদিন পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি বাহিরের ঘরে তক্তপোশে দেহ প্রসারিত করিয়া 'শটকায়' তামাক টানিতেছিলেন ; এমন সময় নটবর কাপড়ের 'পুঁটলি'টা দরজার বাহিরে রাখিয়া, কম্পিত পদে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৈবাহিককে নমস্কার করিল।

গোবিন্দলাল শটকার নল সরাইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "আরে নিতাইয়ের শ্বশুর যে ! এসো এসো, তবে কি মনে করে ?"

ক্ষুদ্র দোকানদারকে 'বেহাই' বলিযা স্বীকার করিতে কারকুণ গোবিন্দ পালের সঙ্কোচ বোধ হইত ; কিন্তু পুত্রের শ্বশুর, একথা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই !

নটবর 'তক্তপোশে'র একপাশে আড়ষ্টভাবে বসিয়া বলিল, "হারাণী আজ দশমাস এসেছে, তাকে নিতে এসেছি।"

গোবিন্দ বলিল, "নিতে এসেছ ! বৌমা পথে বসে আছে আর কি ? আমার মত জানবার পর এলে ভাল হ'তো না ? আর আজ পঞ্চমী, আজ নিতে এসেছ ? এতদিন ঘুমিয়েছিলে ! ঠাট্টা না কি ?"

নটবর বলিল, "ম'শায় মহৎ 'ব্যেক্তি', আমি 'ক্ষুদ্দু'র লোক ; ম'শায়ের সঙ্গে কি আমি ঠাট্টা করবার 'যোগ্যি' ? তবে আমার মেয়ে, তার 'গব্বধারিণী' আজ দশমাস তাকে দেখেনি, মেয়ের জন্য 'দিবে রাত্তির' কাঁদ্‌চে। আমি জ্বর হয়ে পড়েছিলাম, 'পত্তি' করেই উঠে আস্‌চি। আর দুঃখ দেবেন না পাল ম'শায়, একবার দু'দিনের জন্য মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেন, হুকুম মত আমি আবার নিজে মাথায় করে রেখে যাব।"

কারকুণ বাবু 'হো হো' করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এখন মেয়ের উপর খুব দরদ

দেখ্‌চি। বিয়ের সময় ত মেয়েকে ফাঁকি দিতে ছাড়নি! তা, এসেছ, হাত পা ধোও। ওরে শঙ্করা, হুঁকোটা ফিরিয়ে এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যা! আব বাড়ীর ভিতর খবর দে বৌমার বাপ এসেছে।"—পালজী পুনর্ব্বার শট্‌কায় মনোনিবেশ করিলেন।

নটবর বাড়ীর ভিতর গিয়া দাঁড়াইবামাত্র হারাণী লজ্জা ত্যাগ করিয়া—"বাবা!" বলিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া শিশুর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নটবব কষ্টে অশ্রুদমন কবিয়া বলিল, "কেঁদো না মা, তুমি বাজরাণী হও; আমি তোমাকে না নিয়ে যাব না।"

বেযান দ্বাবের আড়ালে দাঁড়াইয়া কন্যাকে বলিল, "ওলো মাণি! দোকানদার 'মিনষে' যেমন, মেয়েটাও তেমনি; অত বড 'ধাড়ী' মেয়ে, বাপের বুকে মুখ নকিয়ে কাঁদ্‌তে লজ্জা হচ্ছে না? আমরাও এককালে মা বাপেব মেয়ে ছিলাম, এমন কলা করতে জানতাম না।"

[১০]

আজ ষষ্ঠী। বাউস্‌মারী গ্রামেব সাহা বাবুদের বাড়ী মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হয়। ষষ্ঠীর দিন অপরাহ্ণে দশ বারোটা পাখাওয়ালা ঢাক মহাশব্দে গ্রাম আলোড়িত করিতে লাগিল; সানাই করুণ রাগিনীতে আগমনীর কোমল গাথা গাহিতে লাগিল। মা আজ বেদীতে উঠিবেন। গ্রামের একপাল উলঙ্গ ছেলে সাহা বাবুদের প্রকাণ্ড দেউড়ীতে দাঁড়াইয়া হা করিয়া বাজনা শুনিতেছিল। পাড়ার মেয়েরা পূজা-বাড়ীর দিকে ঝুঁকিল।

পাতানী বলিল, "মা আমার আজ আসচে! ষ্টীমাব এতক্ষণ কতদূর এলো।"

পাতানী মেয়ের জন্য ভাত বাঁধিয়া পাথরের 'খোরা'য় ঢালিয়া রাখিল; দুধটুকু জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিল। জটাধারীকে দিয়া বাজাব হইতে একপোয়া সন্দেশ আনাইয়া রাখিল;—মনে মনে বলিল, "হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার মাকে আমার কোলে এনে দাও. আহা, কতদিন তাকে দেখিনি!"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। ষষ্ঠীব বাঁকা চাঁদ নির্ম্মল আকাশে বসিয়া হাসিতে লাগিল; ধূপ ধূনার গন্ধে গ্রামখানি যেন উৎসবপূর্ণ। শরতের শুভ্র চন্দ্রালোকে, শীতল নৈশ সমীরণ প্রবাহিত বর্ষা-সলিলপুষ্ট রজনীগন্ধার সুকোমল সৌরভে জননী শারদলক্ষ্মীর উদ্বোধনের আভাস অনুভূত হইতে লাগিল। প্রান্তরের দূরব্যাপী কাশক্ষেত্রে কাশ-কুসুমরাশি বায়ু তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া যেন জননীকে

চামর বীজন করিতে লাগিল।

আলাইলুরের ষ্টীমারঘাটে ষ্টীমারের বংশীধ্বনি হইল। নটবর কন্যার জন্য ষ্টীমার-ঘাটে গাড়ী রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল ; কখন গাড়ী চক্রশব্দ শুনিতে পাইবে এই আশায় পাতানী একবার পথে যায়, একবার বাড়ীতে আসে ; গাছের পাতাটি নড়িলে মনে করে—ঐ বুঝি গাড়ী আসিতেছে।

প্রায় একঘণ্টা পরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীবে দ্বাবের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাব সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল ; পদদ্বয় যেন দেহভার বহনে অসমর্থ।

পাতানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া জ্যোৎস্নালোকে স্বামীকে চিনিতে পারিল, ছুটিয়া গিয়া ব্যাকুলস্বরে নটবরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এলে ; কৈ, আমার হারাণী কৈ ?"

নটবর সেইস্থানে বসিয়া পড়িল,—হতাশভাবে অস্ফুট স্বরে বলিল, "তাকে পাঠালে না,—মাকে আনতে পারলাম না !"

পাতানী ধীরে ধীরে স্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল ; ব্যথিতহৃদয়ে কাতবস্বরে বলিল, "মাগো, তুই আস্‌চিস্‌ ভেবে তোর জন্যে ভাত রেঁধে তোব আশাপথ চেয়ে বসে আছি !"

পূজার বাড়ীর ঢাকের শব্দে ক্ষুদ্র গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল ; কিন্তু ক্ষুদ্র কুটীরদ্বাবে নিপতিত সেই ব্যথিত দম্পতীর কর্ণে তাহা বিজয়াব শোকগাথা বহন করিয়া আনিতে লাগিল।

চতুর্থ স্তবক

দাদা

পল্লীগ্রাম। আষাঢ়ের সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশ-মণ্ডল ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। সমস্ত দিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল সূর্য্যাস্তকালে পশ্চিমগগন-বিলম্বী ধূসর মেঘস্তর লোহিতাভ হইয়া চরাচরে দিবাবসানবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছিল ; কিন্তু আর্চান্বিতে একখানি কালো মেঘ উদ্দাম-ঝটিকাপ্রবাহে কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া, বিদ্যুদ্দন্তবিকাশ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠল ; নদীতীরবর্ত্তী দীর্ঘশীর্ষ ঝাউর শাখাগুলি সোঁ-সোঁ শব্দ করিতে লাগিল। তাহাব পর ঝম্-ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে বৃষ্টির বিরাম নাই। গৃহস্থের ঘরের চালে, গৃহপ্রান্তস্থিত কলাগাছে, বাঁশ-ঝাড়ের ঘন বাঁশেব পাতায় ও ঘরের পাশে শশার টালে ঝুপ-ঝুপ্ কবিয়া বৃষ্টি পডিতেছে। ক্ষুদ্র মাণিকনগরের গ্রাম্য পথ কর্দ্দমে পূর্ণ ; পথের ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা, তাহা বৃষ্টির জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং ভেকের দল সরু মোটা নানা সুরে মহানন্দে বর্ষার বন্দনাগান আরম্ভ করিয়াছে। পথে লোক চলিতেছে না, সকলে স্ব-স্ব গৃহে আশ্রয় লইয়াছে ; কেহ মৃৎপ্রদীপের অদূরে বসিয়া 'ঢেরা'য় পাট কাটিতেছে , কেহ পুঁথি পড়িতেছে ; কেহ বালি দিয়া 'হেঁসো'য় সান দিতেছে ; কোনও নিষ্কর্ম্মা বসিয়া-বসিয়া ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতেছে। শিশু মায়ের কোলে শুইয়া নিমীলিতনেত্রে স্তন্যপান করিতেছে। ছেলে মেয়েরা ঘরের মেঝেতে সারি দিয়া বসিয়া 'আগাডুম্ বাগাডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে'—ছড়াটি কোমল স্বরে আবৃত্তি করিতেছে। দোকানে দোকানী ঝাঁপ বাঁধিয়া একান্তমনে জমা খরচ লিখিতেছে। বহিঃপ্রকৃতির এই বর্ষাসুলভ দুর্য্যোগে তাহার লক্ষ্য নাই, যেন তাহার খরিদ-বিক্রয়ের হিসাবটাই পৃথিবীতে একমাত্র সত্য—আর সকলই মিথ্যা, মায়াময় !

মাণিকনগরের একখানি ক্ষুদ্র গৃহস্থ-গৃহের অভ্যন্তরে সে সময় বহিঃপ্রকৃতির এই দুর্য্যোগের ও অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছিল। এই গৃহে বৃদ্ধ নীলমাধব মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অন্তিমের সম্বল জননী ব্রহ্মময়ীর চরণযুগল চিন্তা করিতেছিলেন ; কিন্তু দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ ছিন্ন করিতে তাঁহার কোটবগত মুদিত নেত্র হইতে অশ্রু বর্ষিত হইতেছিল। পুত্র লালমাধব তাঁহার শিয়রে উপবেশন করিয়া পিতার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতেছিলেন, আর একাগ্র

মনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, "মা মঙ্গলচণ্ডী ! এ যাত্রা বাবাকে বাঁচাও। বাবার অভাবে আমি কি করিয়া এ সংসার চালাইব ?"

কিন্তু লালমাধবের চিন্তাস্রোত সহসা অবরুদ্ধ হইল। বৃদ্ধ নীলমাধব চক্ষু খুলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বাবা লালু, আমার আর অধিক বিলম্ব নাই,—জীবনটা বৃথা কাজে কাটাইয়াছি, তোমাদের জন্য কোনও সম্বল রাখিয়া যাইতে পারিলাম না ; পথের সম্বলও কিছু নাই ! জানি না, ব্রহ্মময়ী চরণে স্থান দিবেন কি না ; কিন্তু এ সময়েও তোমাদের কথা ভাবিয়া বড় কাতর হইয়াছি। নবীনের মা নাই, তাহাকে তোমার ও বৌমার হাতে সঁপিয়া দিলাম ; ছোঁড়াটা যাহাতে মানুষ হইতে পারে—সে চেষ্টা করিও।—দুধের ছেলে নবীন, আমার কাছেই তাহার যত আবদার। দেখো, সে যেন কখনও মনে ব্যথা না পায়। একবার তাকে ডাক, আমার বুকের মধ্যে কেমন-যেন করছে।"

পিতৃভক্ত লালমাধব অশ্রুপূর্ণনেত্রে পিতার আদেশ পালন করিতে চলিলেন। তখন নবীনমাধব রান্নাঘরে একখানি কাঁথায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল, আর লালমাধবের স্ত্রী গিরিবালা উনানে পাঁচন সিদ্ধ করিতেছিলেন।

লালমাধব ব্যগ্রভাবে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আর পাঁচন তৈয়ারী ক'রে কি করবে ? বাবা কেমন-যেন করচেন। সন্ধ্যা থেকে তিনবার ডেকেও কবরেজ মশায়কে আনতে পারলাম না !—এই দুর্যোগের রাত্রি, কি যে হবে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনে। নব্‌নে, নব্‌নে, ওঠ, জন্মের মত বাবাকে দেখে নিবি আয় !"

নবীন উঠিয়া বসিল। আট বৎসরের বালক , মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা নাই। সমস্ত দিন পিতার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সে বৌদিদির কাছে আসিয়া শ্রান্তিভরে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

লালমাধব সুপ্তোত্থিত নবীনকে কোলে লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। গিরিবালাও ব্যস্তভাবে শ্বশুরকে দেখিতে আসিলেন। তখন বৃদ্ধের নাভিশ্বাস উপস্থিত !—লালমাধব নবীনকে পিতার ক্রোড়ের কাছে বসাইয়া তাঁহার মস্তক কোলে তুলিয়া লইলেন, কাতরস্বরে বলিলেন, "বাবা, নবীনকে এনেছি ! তাকে কি বলছেন বলুন।" নীলমাধব বলিলেন, "মায়ের নাম শুনাও বাবা, আমার ছুটী !"—লালমাধব পিতার কর্ণমূলে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইতে লাগিলেন। নীলমাধবের প্রাণ অনিত্য দেহ ত্যাগ করিল। লালমাধব শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। গিরিবালা শ্বশুরের পদদ্বয়ে মস্তক রক্ষা করিয়া অশ্রু ধারায় তাহা সিক্ত করিতে লাগিলেন। নবীনমাধব উভয় হস্তে পিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া "বাবা গো ! বাবা !" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিল।

[২]

নীলমাধব কথকতা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ভাল কথক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল : কথকতার জন্য অনেক বড়লোকেব বাড়ী তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। কোনও কোনও স্থলে তিন মাস পর্য্যন্ত "কথা" চলিত ; সেখানে তিনি যে সিধা ও দক্ষিণা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সংবৎসর সংসার চলিত। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ন্যায় তিনিও অমিতব্যয়ী ও পরদুঃখকাতর ছিলেন ; এ জন্য তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। বার্দ্ধক্যে শরীর অপটু হওয়ায় তিনি কথকতা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; পৈত্রিক কিছু ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, তাহা হইতেই কোনও রকমে সংসাব চলিত। গৃহবিগ্রহের সেবার ত্রুটী হইত না. অতিথিরাও তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিত না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুখদুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় কথক মহাশয় হৃদয়ে আঘাত পাইতেছিলেন, সে ব্যথা তিনি সাম্‌লাইতে পারেন নাই। তিনি হরিনাম করিতেন, আব পত্নীবিরহে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিত। মহাপ্রস্থানের জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু নবীনমাধবকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে ইহলোক-ত্যাগে তাঁহার মন সরিতেছিল না। যম মানুষের সুবিধা অসুবিধা দেখে না ; হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে তাঁহাকে সংসার-পারাবারের পরপ্রান্তে এক অজ্ঞাত রাজ্যে যাত্রা করিতে হইল।

কাহারও অভাবে সংসার অচল থাকে না। পিতার অভাবেও লালমাধবের সংসার চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে সুখে ও নিরুদ্বেগে সংসার চলিত, এখন দুঃখে ও নানা দুশ্চিন্তায় সংসার চলিতে লাগিল! শাশুড়ী গিরিবালাকে পাকা গৃহিণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। সংসারের অভাব ও দারিদ্র্যের অশান্তি গিরিবালা প্রাণপণে গোপন করিতেন, স্বামীকেও তাহা জানিতে দিতেন না। বস্তুতঃ, শ্বশুরের মৃত্যুর পর গিরিবালাই লালমাধবের অভিভাবিকা হইলেন। গিরিবালা একালের আত্মসুখনিরতা বিলাসিনী বধূ হইলে লালমাধবকে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সংসার ছাড়িয়া পলাইতে হইত।

গিরিবালার প্রধান কার্য্য ছিল, দেবর নবীনমাধবের লালনপালন। নবীনমাধবের বয়স যখন তিন বৎসর, সেই সময় তাহার মাতার মৃত্যু হয়।—সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে গিরিবালা নবীনকে পুত্রাধিক স্নেহে যত্নে লালনপালন করিয়া আসিতেছেন। নবীন এখন গিরিবালাকেই মা বলিয়া

জানে। গিরিবালার কোন সন্তান ছিল না, নবীনই তাঁহার সকল স্নেহ অধিকার করিয়াছিল।—পিতার নিকট তাড়া খাইয়া পলাইয়া আসিয়া সে বৌদিদির কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিত।

লালমাধব পল্লীগ্রামের গৃহস্থ, তাহার অভাব সামান্য ছিল। কারণ, বিলাসিতার সহিত কখনও তাঁহার পরিচয় হয় নাই। বাড়ীতে যে দুই তিনটি পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহারা মাঠে চরিয়া আসিয়া যথেষ্ট দুধ দিত ; সুতরাং গয়লার জল তাঁহাকে দুধ বলিয়া কিনিতে হইত না। বাড়ীর আঙিনায় কয়েক কাঠা জমীতে একটি বাগান ছিল, তাহাতে নিত্য ব্যবহার্য্য তরি-তরকারী ও কলা, পেঁপে, আতা, ডালিম প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হইত। মাঠে ধানের জমীতে যে ধান হইত, তাহাতে সংসারের খরচ চলিত, তবে কয়েক বৎসর 'অজন্মা' হওয়ায় লালমাধব কিছু কষ্টে পড়িয়াছিলেন। তথাপি তিনি দুঃস্থ গ্রামবাসিগণের দুঃখ দেখিলে সাধ্যানুসারে তাহাদের সাহায্য করিতেন। দরিদ্রা পল্লীরমণীগণ গিরিবালাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মনে করিত।

সাংসারিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন লালমাধব দাস-দাসী রাখিতে পারিতেন না, এজন্য গিরিবালাকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইত। লালমাধব ইহাতে বড় কষ্ট বোধ করিতেন ; একদিন তিনি গিরিবালাকে বলিলেন, "তোমার কষ্ট আর দেখ্‌তে পারি নে। এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়? সস্তায় একটা ঝি জুট্‌লে রাখ্‌তাম্ ; কিন্তু যে কঠিন কাল পড়েছে, মাসে পাঁচ টাকা খরচ করতে না পারলে আর একটা চাকরাণী রাখা যায় না।"

গিরিবালা সলজ্জভাবে বলিলেন, "চাক্‌রাণীতে আমার দরকার কি? গোবিন্দ করুন, খাট্‌তে-খাট্‌তে তোমার পায়ে মাথা রেখেই যেন চক্ষু বুঁজ্‌তে পারি। দুঃখকে দুঃখ মনে কর্‌লেই দুঃখ।"

লালমাধব বলিলেন, "নবনে যদি কখনও মানুষ হতে পারে, তা' হলেই আমাদের দুঃখ ঘুচ্‌বে।"

গিরিবালা বলিলেন, "আমরা খেয়ে-না-খেয়ে ওকে মানুষ করে তুল্‌তে পারি ত ঠাকুর স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন।—ঠাকুরপো মনে করে,—আমিই ওর মা ; মায়ের কথা ওর মনে নেই। আহা, একশ' বছরের হয়ে বেঁচে থাক ; ওর যেমন পড়াশুনায় ঝোঁক, তাতে বাপ্ দাদার নাম রাখ্‌তে পারবে।"

কয়েক বৎসর পরে নবীনমাধব গ্রামের এন্‌ট্রেন্স স্কুল হইতে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিল। কয়েক মাসের বেতন ও পরীক্ষার ফি দাখিল করিতে লালমাধবকে দশদিক অন্ধকার দেখিতে হইল ; অবশেষে তিনি দুই বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী বিক্রয় করিয়া

এ দায় হইতে উদ্ধারলাভ করিলেন। সেবার শীতকালে আর তাঁহাব 'চালে' খড় উঠিল না ; বর্ষাকালে জীর্ণ 'চাল' ভেদ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। 'চালি'ব উপর লেপ, কাঁথা, বালিশ ছিল ; আষাঢ়ের অবিশ্রান্ত বর্ষণে তাহা ভিজিয়া গেল। লালমাধব দুঃখিতভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, "শীতকালে ঘব ছাইতে পাবিনি ; জানি, এবার বর্ষায় ভিজ্‌তে হবে। আমার 'নুন আন্‌তে পান্‌তো ফুরোয়, পান্‌তো আন্‌তে নুন',—কি দিযে কি করি, ভেবে পাইনে ! টাকায় বিশ আঁটি খড়, তাবও বারো আনা কেশে, আর সিকি উলু। উইয়েব দৌরাত্ম্যে বচ্ছর অন্তব চালে খড় না দিলেও চলে না। নবনের পরীক্ষার খরচ যোগাতেই এবার সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। পাশটা যদি করতে পারে, তবেই অর্থব্যয় সার্থক হবে।"

গিরিবালা বলিলেন, "কষ্টেস্রেষ্টে ত ঠাকুবপোকে মানুষ কবে তোল, এমন দিন থাক্‌বে না। ঠাকুরপো দু' পয়সা আন্‌তে পারলে একটা ছোট-খাট পাকা কুঠুবি করো, যে 'আগুণ পাণি'র ভয় !"

লালমাধব হাসিয়া বলিলেন, "কাঙ্গালের কর্কট বাশ ! আমি আবার পাকা ইমারত করবো ! তুমিও যেমন !"—তাঁহার হাসি নৈরাশ্যমিশ্রিত।

[৩]

নবীনমাধব সে বৎসব এনট্রেন্স পরীক্ষাব উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকা বৃত্তি লাভ করিল।—এ দিকে ত্রিশ বৎসর বয়সে গিরিবালার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।—গ্রামের লোকেরা বলিতে লাগিল, "এতদিনে লালমাধব মুখুয্যের অদেষ্ট ফিরেছে !" ছত্রিশ বৎসব বয়সে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ কবিয়া লালমাধব স্বর্গ হাতে পাইলেন ; পুত্রের নাম রাখিলেন,—ইন্দুমাধব।

নবীনমাধব তাহার বাসগ্রামের আঠার ক্রোশ দূরবর্ত্তী বহরমপুর কলেজে এল্‌-এ পড়িতে গেল। নবীন দাদাকে পাঠ্যপুস্তকেব ফর্দ্দ পাঠাইল। পুস্তকের মূল্য দেখিয়াই লালমাধব মাথায় হাত দিয়া বসিলেন ! তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণ শুনিয়া গিরিবালা বলিলেন, "টাকার জন্যে তুমি ভেবো না, আমিই একটা উপায় করব।"—তিনি তাঁহাব পিতৃদত্ত পাঁচ ভরির সোনার বালা দত্ত-বাড়ীতে বন্ধক দিয়া সত্তর টাকা আনিযা স্বামীর হস্তে দিলেন।—লালমাধব বিপদ-সমুদ্রে কূল পাইলেন ; গিরিবালাকে বলিলেন, "আমি গরীব বটে, কিন্তু হতভাগ্য নই ; তোমার মত স্ত্রী যার সংসারে, তার দুঃখ কি ? কেবল আক্ষেপ এই যে, তোমাকে ত কখনও দু' তোলা সোনা রূপো দিতে পারলাম না, উপরন্তু তোমার বাবা তোমাকে যে দু' ভবি দিয়েছিলেন, তাও তোমাকে আমাদের জন্যে ঘুচোতে

হচ্ছে !”

গিরিবাল হাসিয়া বলিলেন, “ঠাকুরপোর বিদ্যে হোক ; আমি না-হয় হাতে লাল সূতো জড়িয়ে ‘এয়োতি’ বক্ষা করবো।”

লালমাধব আহ্লাদে গদগদ হইয়া পত্নীকে আলিঙ্গন-দানে উদ্যত হইলেন ! গিরিবালা লজ্জায় অভিভূত হইয়া দুই হাত সরিয়া গিয়া বলিলেন, “ও আবার কি রঙ্গ !—আমি কচি খুকী কি না, তাই আদর করতে এলে।”

নবীনমাধবের ঐ পনের টাকা বৃত্তিমাত্র সম্বল ; সে তাহার অবস্থার কথা জানাইয়া রাজবাড়ীতে কিছু মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিল ; কিন্তু সে পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্রের পুত্র, কোনও হাকিম বা ক্ষমতাশালী পদস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে সুপারিশ-চিঠি সংগ্রহ কবিতে না পারায় তাহার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। সাধকশ্রেষ্ঠ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন, “যাহার চাপ্‌রাস নাই, তাহার কথা কেহ শোনে না।”—যে চাপ্‌রাসে রাজা মহারাজার মন আকৃষ্ট হয়, এবং লোহার সিন্দুক খুলিয়া যায়, বালক নবীন সে চাপ্‌রাস কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে ? তাহার দুঃখ ঘুচিল না , সে একটি ‘টিউশনী’ জুটাইয়া ভবণপোষণ ও পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কিন্তু এল্‌-এ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে, পাঠের ক্ষতি হয দেখিয়া সে ‘টিউশনী’ ছাড়িয়া দিয়া তাহার অর্থাভাবের কথা দাদাকে জানাইল। লালমাধব আবাব পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন ! গিরিবালা তাঁহার শেষ সম্বল সোনার তাগা জোড়াটা বিক্রয় করিয়া দেবরের এল-এ পরীক্ষাব খরচ চালাইলেন।

এইবার যখন নবীনমাধব কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়া বহরমপুর কলেজ হইতে এল্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। নানা স্থান হইতে ঘটকের দল আসিয়া লালমাধবকে বিব্রত করিয়া তুলিল। যাহারা তাঁহাকে একটি রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্য প্রদানের লোভ দেখাইল, তাহাদিগকে তিনি জানাইলেন, তিনি দরিদ্র বটে, কিন্তু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া একটা বড়-রকম ‘দাঁও’ মারিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই ; মেয়েটি সুন্দরী হয়, বংশ ভাল হয় ; এবং কন্যার পিতা নবীনের উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহনে সম্মত হন, তাহা হইলেই তিনি যথেষ্ট মনে করিবেন।

লালমাধবকে এত অল্পে রাজী হইতে দেখিয়া গ্রামের বুদ্ধিমানেরা তাঁহার বুদ্ধির নিন্দা কবিতে লাগিল। প্রতিবেশী চাটুয্যে মহাশয় তিনটি ছেলেকে বিবাহের বাজারে নিলামে চড়াইয়া নগদ হাজারদশেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ; তিনি একদিন লালমাধবকে ডাকিয়া মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, বলিলেন, “বাবাজী, আজকাল যেমন কাল পড়িয়াছে, সেই ভাবেই চলা উচিত ;

রাঢ়ী ব্রাহ্মণের ঘরের এল্-এ পাশ ছেলে, মাসে বিশ টাকা জলপানি পাইতেছে, একটু যদি 'আঁট' ধর, তাহা হইলে উহার বিবাহ দিয়া অনায়াসে পাঁচটি হাজার টাকা ঘরে তুলিতে পার। তাহা না করিয়া তুমি এমন সুপাত্রকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিতে চাও ! পরিবারের গহনা বিক্রয় করিয়া, জোত-জমা বন্দক রাখিয়া ভাইটিকে মানুষ করিলে ; তাহাতে তোমার লাভ কি ? এমন বোকামী করিও না ; একটু বুঝিয়া চল।"

লালমাধব বলিলেন, "খুড়ো মশায়, আপনি একজন প্রবীণ লোক, আপনি এমন আদেশ করবেন না ; আমি ত পাঁঠা বিক্রয় করতে বসিনি ; গরীব মানুষ আমি, আমার কি এত লোভ শোভা পায় ? যাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতা করব, তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে কিছু আদায় করলেই কি আমি বড়মানুষ হব ? বাবা আজ বেঁচে থাকলে আপনার কথা শুনে কানে হাত দিতেন। আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয় বলেই ভায়ার বিয়ে দিয়ে তার লেখাপড়ার খরচাটা নিতে চাচ্ছি ; এই হীনতা-স্বীকারের জন্যে আমার মনে যে কষ্ট হচ্ছে, তা অন্তর্যামীই জানেন ; তার উপর আবার টাকার চাপ দেব ? সে আমি পারব না। আমার যদি দুই একটি মেয়ে থাক্‌ত, আর বেয়াই মশায় যদি লম্বা ফর্দ্দ দাখিল করতেন, তা হ'লে আমার কি গতি হ'ত ?"

খুড়ো চাটুয্যে মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তাহাদের বিবাহের খরচাও নবীনের শ্বশুরের ঘাড়ে চাপাইতে ! তুমি আমার নিতান্ত আপনার জন, তাই তোমাকে সৎপরামর্শ দিলাম ; না শোনো, শেষে পস্তাইয়া মরিবে।"

লালমাধব চাটুয্যে-খুড়োর পরামর্শ কানে না তুলিয়া সব-জজ কৈলাস বাবুর কন্যা সুকুমারীর সহিত ভ্রাতার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কৈলাসবাবু লালমাধবের সাংসারিক অবস্থার কথা জানিতেন ; কিন্তু নবীনমাধবের মত ছেলে সচরাচর মেলে না। তিনি নবীনকে এম্-এ পর্য্যন্ত নিজের খরচে পড়াইতে রাজী হইলেন। মেয়েটিও পরমাসুন্দরী। লালমাধব দেনাপাওনা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলেন না। কৈলাসবাবু মনে করিলেন, "আমি উহার ঘরে মেয়ে দিতেছি, ইহাই উহার বাপের ভাগ্য ; আবার টাকার দাবী করিবে ! মেয়েটিকে খুব সস্তায় পার করিলাম।"—মাঘ মাসের শেষে কৈলাসবাবুর কলিকাতাস্থ ভবনে সুকুমারীর সহিত নবীনের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে সঙ্গে লইয়া লালমাধব মাণিকনগরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। জজবাবুর আদরিণী সুন্দরী কন্যা গরীবের ঘরে পড়িয়াছে, গ্রামের রমণীসমাজ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌ দেখিতে আসিল। সুকুমারীর যেমন রূপ, তেমনই গা-ভরা গহনা ! পল্লীরমণীগণের মুখে প্রশংসার

বান ডাকিল।

আজ গিরিবালার আনন্দের সীমা নাই। তিনি নববধূকে কোথায় রাখিবেন, কি খাওয়াইবেন, কেমন করিয়া আদর যত্ন করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।—নববধূকে বরণ করিয়া লইবার সময় তাঁহার মনে পড়িল, শাশুড়ী অকালে প্রাণ ত্যাগ করিলে তিনি প্রাণপণ যত্নে শিশু দেবরটিকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিজেব মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিযাছেন ; নিজে ছিন্ন বস্ত্রে থাকিয়া তাহার বস্ত্র যোগাইয়াছেন ; দেবরের রোগের সময় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছেন ; পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন ; তাহাকে কোনও দিন মায়ের অভাব জানিতে দেন নাই।—সেই দেবব আজ বিদ্বান হইয়া বংশ উজ্জ্বল করিয়াছে ; মস্ত হাকিমের মেয়ে সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। ভগবান তাঁহাদের ভাগ্যে এত সুখ লিখিয়াছিলেন ? হায়, আজ যদি শ্বশুর-শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতেন !—তাঁহারা এই সুখ ভোগ করিতে পাইলেন না ভাবিয়া গিবিবালার চক্ষু হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নববধূর সঙ্গে ঝি, চাকর ও দ্বারবান আসিয়াছিল ; গরীব লালমাধব তাহাদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইযা উঠিলেন। তিনি তাহাদের এরূপ সেবা করিতে লাগিলেন, যেন গুরুঠাকুর শিষ্য-বাড়ী আসিয়াছেন !—পাকস্পর্শেব ভোজ শেষ না হওয়া পর্যান্ত লালমাধব নববধূকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইতে পারিলেন না।

বাড়ীতে দুইখানিমাত্র বাসের ঘর ; আর একখানি অনতিবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ। গিরিবালা যে ঘরখানিতে থাকিতেন, তাহার মেটে দেওয়াল ; দেওয়ালে কয়েকখানি ঠাকুর-দেবতার চিত্র, ঘরের মাটী-কোঠায় আমকাঠের তক্তার পাটাতন। ঘরের মধ্যে চৌকি ; একদিকে কাঠের সিন্দুক, সিন্দুকের পাশে একটি বেতের ঝাঁপি। একটি বাঁশের আড়ায় লেপ তসুক স্তরেস্তরে সজ্জিত ; তাহাব উপর 'ধোপদস্ত' কাপড়ের আবরণ। পরিচ্ছন্ন মেঝেতে ধূলা নাই। ঘরের যে কয়েকটি দ্বার জানালা ছিল, তাহা নিতান্ত অপ্রশস্ত।—গিরিবালা নববধূর বাসের জন্য এই ঘরখানি ছাড়িয়া দিলেন।

ঘব দেখিয়া সুকুমাবীর চক্ষু স্থির ! এই গরুর-গোযালে তাহাকে থাকিতে হইবে ? সাবজজ বাবুর গোয়ালঘরও যে ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ! শার্সিখড়খড়ি, বৈদ্যুতিক পাখা ও বিদ্যুতের আলো দূরে থাক, দ্বার-জানালাগুলি এত ছোট যে, ঘরে প্রবেশ করিয়া সুকুমারী পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হাঁপাইযা উঠিল। তাহার পব যেদিন সে অরণ্যবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ বনপথ দিয়া বিরলসলিলা

অপ্রশস্ত নদীর পঙ্কিল জলে স্নান করিয়া আসিল, সে দিন পিতৃভবনের প্রাঙ্গণস্থিত জলের কল ও চৌবাচ্চাপূর্ণ কলের জলের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল ! সে পল্লীজীবনকে নিদারুণ অভিশাপ ও পল্লীবাসকে বনবাস মনে করিতে লাগিল ।—আবার তাহার বড় জা-টিই বা কেমন ?—গায়ে একটা সেমিজ বা জামা নাই, কস্তাপেড়ে ময়লা শাড়ী-পরা, হাতে শাঁখা ; সাদাসিধে গড়ন, মোটা-সোটা কালো স্ত্রীলোক : হাতে না আছে দু'গাছা বালা, গলায় না আছে বিনোদবেণী 'নেকলেস্' ।—সুকুমারী ভাবিল, তাহার মায়ের দাসী মুক্তকেশী ইহা অপেক্ষা অনেক সভ্য-ভব্য ।—এই জায়ের সঙ্গে এখানে বাস করিতে হইবে ভাবিয়া সুকুমারী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল । সুকুমারীর সঙ্গে যে ঝি আসিয়াছিল, তাহার নাম ভবতারিণী । ভবতারিণী অনেক কালের ঝি ; সুকুমারীকে সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল । ভবতারিণীর হাতে তাগা, গলায় সোনার দানা, পরিধানে তসর ;—দেখিয়া মনে হয়, গুরুঠাকুরাণী শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্য শ্রীপাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার গৃহে পদরজ দান করিতে আসিয়াছেন !—সুকুমারী ভবতারিণীর কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল । ভবতারিণী তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "তোমার বাপের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে ! এমন সোনার সীতেকেও এমন বনে পাঠায় ? কোথায় সোনার 'অট্টালিকে', আর কোথায় এই 'কদয্যি' কুঁড়ে ঘর !"

কথাটা তখনই শাখাপল্লব-সমলঙ্কৃত হইয়া পাড়ায়-পাড়ায় পল্লীরমণীগণের মুখে-মুখে ঘুরিতে লাগিল !—গিরিবালা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "রাঙ্গা বৌর ঝি এ কথা কক্‌খন বলেনি !"

গৌরীর মা বলিল, "কেন ? ঝিয়ে-বৌয়ে যখন কথা হয়, তখন আমাদের নয়নতারা 'পিঁড়ে'য় বসে তা শুনে এসেছে যে ! ঢাকো কেন ?"

স্নানের ঘাটে এ সকল আলোচনা চলিতেছিল । কালাচাঁদের মা গামছার ভিতর হাত রাখিয়া আহ্নিক করিতে করিতে বলিলেন, "নুকোলে কি হবে বৌমা ! কাজটা কিন্তু তোমাদের ভাল হয়নি ; তোমরা হ'লে 'গেরস্ত' মানুষ ; জজ্-'মাছেরটাকে'র মেয়ে ঘরে আনা কি তোমাদের মত 'নোকে'র সাজে ? এই দেখ আমার 'ভগ্গিনপোৎ' ডিবটী হাকিম ; সে যদি আমাদের ফণীর (ভগিনীপুত্র) বিয়ে কোনও 'সদরওয়ালা'র মেয়ের সঙ্গে দেয় ত সাজে ভাল । কেউ কোন কথা বল্‌তে পারে না । 'কিন্তুক' তোমাদের হয়েছে হাত চেয়ে আম মোটা ! আরও কত কথা শুনতে হবে ।"

দত্ত-গিন্নী গামছায় মুখ-মার্জ্জনা করিতে-করিতে বলিলেন, "পেটের ছেলের মত দেওরটিকে মানুষ করেছ মা ! হাকিমের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ত দিলে, শেষটা

সামলাতে পারবে কি ? এ বৌ যদি তোমার সঙ্গে ঘর করে ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। তোমার আমও যাবে—ছালাও যাবে ! পরের মেয়ের সুখের জন্যেই কি ছেলেকে এত-বড়টা করেছিলে ?”

গিরিবালা অস্ফুটস্বরে বলিলেন, “ঠাকুর-পোর ত ভাল হবে। নিজের সুখের ‘পিত্যেশায়’ এ কাজ করিনি ঠাক্‌রুণ !”

গিরিবালা এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তিনি হৃদয়ে কি এক অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিলেন। তাঁহার নয়নকোণে অশ্রু সঞ্চিত হইল। রমণীহৃদয়ের রহস্য দুর্ব্বোধ্য ! গিরিবালা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া জলপূর্ণ কলসকক্ষে বাড়ী ফিরিলেন।—তখন ঘাটে খুব উৎসাহের সহিত সমালোচনা চলিল ! দত্ত-গিন্নী ঘড়ায় জল পুরিতে-পুরিতে বলিলেন, “ঢের-ঢের দাসী-বাঁদী দেখেছি বাপু ! কিন্তু কল্‌কাতার এই ঝি-বেটী যেন খড়দার মা-গোঁসাই, চোখে-মুখে কথা, আর ‘ঠ্যাকার’ই বা কত !”

কালাচাঁদের মা আহ্নিক মুলতুবী রাখিয়া বলিলেন, “আবার ‘বিধ্‌বে’ মাগীর গলায় সোনার দানা ! ‘বুড়ো বয়সে চুড়ো কম্ম’ !”

ঠিক সেই সময়ে বকুলতলায় দাঁড়াইয়া তামাক টানিতে-টানিতে লালমাধবের গ্রাম সম্পর্কের খুড়ো সেই বুড়ো চাটুয্যে মশায় লালমাধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, “বাপু হে, তখনই ত বলেছিলাম, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেয়ো না ! গরীবের ঘর থেকে খাসা টুক্‌টুকে বৌ আন্‌বে ; মন দিয়ে ঘরকন্না করবে, দু'কথা জোর ক'রে বল্‌লে ঘাড় হেঁট ক'রে শুনবে। তা নয়, ভাইয়ের বিয়ে দিলে এক সদরওয়ালার মেয়ের সঙ্গে ! পেলে ত কচু, মধ্যে থেকে ভাইটি হাতছাড়া হবে।—‘লাভঃ পরম্‌ গোবধঃ।’

লালমাধব বলিলেন, “লাভের জন্য ত একাজ করিনি খুড়ো মশায় ! ছোঁড়ার ত একটা ‘হিল্লে’ হলো।”

গ্রামের পুরুষ ও রমণীসমাজ একমত হইয়া রায় প্রকাশ করিল,—লালমাধব বুঝিতে না পারিয়া বড়ই দুষ্কর্ম করিয়া বসিয়াছে !—লালমাধবের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল।

পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ লালমাধব সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া গ্রামের ‘শূদ্রভদ্র’ সকলকে পাকস্পর্শের ভোজ দিলেন !—গিরিবালা অনুগত দাসীর ন্যায় পরম যত্নে নববধূর সেবা করিতে লাগিলেন।

[৪]

সুকুমারী পিতৃগৃহে ফিরিয়া হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল ; যেন সে একটা বিকট

দুঃস্বপ্নের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল ! বিশেষতঃ দাসী ভবতারিণী যখন লালমাধবের গৃহস্থালীর কথা সালঙ্কারে সদরালা-গৃহিণীর গোচর করিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবনে তিনি কন্যাকে এমন কুস্থলে পাঠাইবেন না ; বলিলেন, "নবীন চাকরি করিয়া দু' পয়সা সঞ্চয় করিলে কলিকাতার কাঁশারীপাড়ায় নিজের বাড়ীর কাছে দেখিয়া-শুনিয়া তাহাকে একটি বাড়ী করিয়া দিবেন। নবীনকে দেখিয়াই তিনি তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন ; পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র লালমাধবের সহিত তাঁহার মেয়ে-জামাইয়ের সম্বন্ধ কি ?

শ্বশুরের কাঁশারীপাড়ার বাড়ীতে থাকিয়া নবীনমাধব প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়িতে লাগিল। বি-এ পাশ করিয়াই সে মুরুব্বী শ্বশুরের চেষ্টায় ও মুরুব্বীর অনুগ্রহে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটী লাভ করিল, এবং বৰ্দ্ধমানে শিক্ষানবীশ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইল।

সদরালার কন্যাকে বিবাহ করিয়া, পূৰ্ব্বেই নবীনের মেজাজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল , ডেপুটীগিরি লাভ করিয়া তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল ! সে সদরালা কৈলাসবাবুর জামাতা, এবং বৰ্দ্ধমানের 'প্রবেশনারী' ডেপুটী কালেক্টর , ইহাই এখন তাহার পরিচয়।---কিন্তু বাল্যস্মৃতি সহজে মানুষের মস্তিষ্ককোটর ত্যাগ করে না ; নবীনমাধবের যখনই মনে হইত, সে পল্লীগ্রামের এক নিঃস্ব কথকের পুত্র, অভাব ও দৈন্যে তাহার শৈশব-জীবন অতিবাহিত হইয়াছে ; তখন লজ্জায় ও ক্ষোভে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইত। সে সযত্নে দুঃখময় শৈশব-স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত। বন্ধুসমাজে পল্লীগ্রামের প্রসঙ্গ উঠিলে নবীন সকলের অপেক্ষা অধিক উৎসাহে আমাদের অনন্ত স্নেহের আধারস্বরূপিণী চিরকরুণাময়ী পল্লী-জননীর নিন্দা করিত।

নবীন ডেপুটী হইয়াছে শুনিয়া লালমাধব ও গিরিবালা আনন্দে অভিভূত হইলেন, এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা পাঠাইয়া দিলেন।---খুড়ো চাটুয্যে মহাশয় এই সুসংবাদে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বেল পাকলে কাকের কি ?"

অতঃপর ডেপুটী ভাইটিকে একবার বাড়ীতে আনিবার জন্য লালমাধব তাহাকে দুই তিনখানি পত্র লিখিলেন। নবীন অনেকদিন হইতেই দাদাকে পত্র লেখা এক-রকম ছাড়িয়া দিয়াছিল , কিন্তু ক্রমাগত তিনখানি পত্র পাইয়া সে উত্তর না দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না, সংক্ষেপে দাদাকে জানাইল, এখন তাহার বাড়ী যাইবার অবকাশ নাই ; এবং পল্লীগ্রামের সহিত সম্বন্ধ রাখা সে গৌরবজনক মনে করে না। বিশেষতঃ, ম্যালেরিয়ার বাস্তুভিটা পল্লীগ্রামে গিয়া জ্বরে পড়িতে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহও নাই।

লালমাধব ভ্রাতার পত্র পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন , গিরিবালার মৰ্ম্মবেদনার

সীমা রহিল না।—তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপোকে ছেলেবেলা থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, নিজে না খেয়ে খাইয়েছি, মায়ের অভাব কোন দিন তাকে জানতে দিই নি !—বড়লোকের ঘরে ঠাকুরপোর বিয়ে না দিলে আজ হয়ত সে আমাদের পর মনে করতো না।"

লালমাধব বলিলেন. "নবীন যা-ই মনে করুক, সে আমার ভাই ; আমার ত পর নয়। সে যাতে সুখী হয়, তাই ভাল। তার সুখেই আমাদের সুখ। আহা, ছেলেবেলায় দাদা আমার কত কষ্ট পেয়েছে ! সে কথা মনে করে যদি তার দুঃখ হয়ে থাকে. তবে সে জন্যে আমরা এক মুহূর্তও যেন তাকে অকৃতজ্ঞ মনে না করি।"

কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্তিত হইল না।—এ দিকে নবীনমাধব অল্পদিনেই চাকরীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে মহকুমার শাসন-ভার পাইল। মহকুমাও পল্লীগ্রাম ; বাধ্য হইয়া তাহাকে সেখানে যাইতে হইল বটে, কিন্তু জন্মভিটায় গিয়া একবার সে দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবারও অবসর পাইল না !—কয়েক বৎসর পরে তিন মাসের 'প্রিভিলেজ্‌লিভ্' লইয়া নবীন কলিকাতায় গিয়াছে শুনিয়া লালমাধব আবার তাহাকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন. কিন্তু নবীনের সেই এক উত্তর ! পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার দারুণ উপদ্রব, সেখানে সুপেয় জল নাই, বাস করিবার উপযুক্ত ঘর নাই ; সেখানে গিয়া বিপন্ন হইতে তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।

কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহের নিকট কোনপ্রকার সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা নাই। প্রাণাধিক ভাইটিকে দীর্ঘকাল না দেখিয়া লালমাধব অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন ; এবং একবার তাহাকে দেখিতে কলিকাতায় যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পত্নীর নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।—লালমাধবের পুত্র ইন্দুমাধব তখন একটু বড় হইয়াছিল : সে বলিল, "বাবা ! আমি তোমার সঙ্গে কাকাকে দেখতে যাব।" গিরিবালা একবার আপত্তি করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। লালমাধব পুত্রসহ কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

গিরিবালা দেবরের জন্য এক হাঁড়ি সোনা-মুগের ডাল, বাগানের মিষ্ট আমের কয়েকখানি আমসত্ত্ব, বাড়ীর গাছের নারিকেলের এক হাঁড়ি নাড়ু ও ঘরের দুধের সর বাটিয়া এক ভাঁড় ঘি প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সঙ্গে দিলেন।

লালমাধব বলিলেন, "কলিকাতা যায়গা, সেখানে কত রকম মেঠাই মণ্ডা, ছানাবড়া, পান্‌তুয়া, খাজা, গজা পাওয়া যায়.—সেখানে তোমার এ নারকেলের নাড়ু নিয়ে গিয়ে কি করব ? লোকে দেখে হাস্‌বে যে !"

গিরিবালা বলিলেন, "আমি নারকেলের নাড়ুগুলি চিনির রসে পাক করে

মশ্‌লা দিয়ে 'তোয়ের' করেছি। ঠাকুরপো ছেলেবেলায় এই নাড়ু বড় ভালবাস্‌তো। কতদিন তাকে নিজের হাতে খেতে দিই নি ; দুটো নাড়ুও যদি সে মুখে দেয়, তবে আমার 'ছেরম সাথ্‌থক' হবে। তুমি নিয়ে যাও।"

এই সকল উপহাব-দ্রব্যসহ শিশু-পুত্র ইন্দুমাধবকে সঙ্গে লইয়া লালমাধব গরুর গাড়ীতে দীর্ঘ সাত ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ভেড়ামারা ষ্টেশনে ট্রেন ধরিলেন, এবং সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলেন।

লালমাধব কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বে অনেকবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন, সুতরাং কলিকাতার পথ-ঘাট তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না।—আষাঢ় মাস, বর্ষার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন , সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিযাছে। কাদায় কলিকাতার পথে চলা দুঃসাধ্য। ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া লালমাধব একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিলেন , সময় বুঝিয়া কোচ্‌ম্যান কাঁশারীপাড়ায় যাইতে দেড় টাকা ভাড়া হাঁকিয়া বসিল।

লালমাধব পল্লীগ্রামের লোক, বিশেষতঃ ধনবান নহেন ; এক মাইল যাইতে দেড় টাকা গাড়ী ভাড়া দেওয়া তিনি অপব্যয় মনে করিলেন।—ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ইন্দু ! আধ ক্রোশ পথ হেঁটে যেতে পারবি ?"—কাকাকে দেখিবার জন্য ইন্দুমাধবের ভারি উৎসাহ হইয়াছিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুব পারবো বাবা ! চল, হেঁটেই যাই, গাড়ীতে আর কাজ নেই।"

তখন মুটের মাথায় মোট তুলিয়া দিয়া, পুত্রের হাত ধরিয়া লালমাধব 'শ্রীদুর্গা' স্মরণ করিয়া রাজপথে নামিযা পড়িলেন। মুটে হাঁড়িগুলি ঝাঁকায় সাজাইয়া লইয়া দুল্‌কীচালে আগে-আগে চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় আটটার সময় লালমাধব সদরালা বাবুর দেউড়ীতে আসিয়া মোট নামাইলেন।—একজন দ্বারবান তখন সিদ্ধির নেশায় ভরপুর হইয়া দেউড়ীর পাশের একটা কুঠুরীতে চার-পাইর উপর শয়ন করিয়া মিহি সুরে একটা ভজন গায়িতেছিল। দেউড়ীতে কলরব শুনিয়া সে উঠিয়া আসিল ; লালমাধবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিতে পারিল, আগন্তুক জামাইবাবুর দাদা, ভাইকে দেখিবার জন্য দেশ হইতে আসিয়াছেন।

নবীন ডেপুটী তখন দ্বিতলস্থ বিদ্যুতালোকিত সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুগণের সহিত পাশা খেলিতেছিল। গড়গড়ার মাথায় প্রকাণ্ড কলিকা, সুগন্ধি তামাকুর সুমিষ্ট গন্ধ গৃহের বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছিল ; এবং নবীনমাধবের 'টেরিয়ার' কুকুরটি পাপোশের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। এমন সময় পুরাতন ঠন্‌ঠনের চটী পায়ে—এক-পা কাদা ও মাথায়

দোদুল্যমান টিকি লইয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর লালমাধব পুত্রের হাত ধরিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

লালমাধবকে দেখিয়া নবীনের বন্ধুগণ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহাদের মনে হইল, লোকটা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ : বোধ হয় কিঞ্চিৎ ভিক্ষার আশায় অসময়ে এখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে!—কিন্তু নবীনমাধবের কথায় তাহাদের বিস্ময় কৌতূহলে পরিণত হইল। নবীনমাধব দীর্ঘকাল পরে দাদাকে দেখিলেও, তাঁহাকে চিনিতে পারিল। সে মিনিটখানেক স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "কি রকম? আপনি হঠাৎ এখানে!"—উঠিয়া দাদাকে প্রণাম করিতেও তাহার ভুল হইয়া গেল!

দাদা বলিলেন, "অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই মন বড় ব্যাকুল হওয়ায় একবার তোমাকে দেখতে এলাম।"

নবীন বলিল, "বিলক্ষণ! আগে একটা সংবাদ দিতে হয়।—সঙ্গে এ ছেলেটি—?"

লালমাধব তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওকে চিনতে পারচো না? চিনবেই বা কি করে, এতদিন ত দেখনি। ও ইন্দুমাধব, তোমার ভাইপো।—আমি তোমাকে সংবাদ না দিয়েই এসে পড়েছি।—ইন্দু, তোর কাকাকে প্রণাম কর।"

ইন্দুমাধব এত বড় বাড়ীতে কখনও প্রবেশ করে নাই, গৃহসজ্জা দেখিয়া তাহার তাক লাগিয়া গেল। সে তাহার ছেঁড়া জুতা খুলিয়া গালিচার উপর গেল, এবং কাকাকে প্রণাম করিল। লালমাধব দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া ভৃত্য একখানি চেয়ার সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল।

একজন বন্ধু সকৌতুকে নবীনকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে হন উনি?"

নবীন কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "দাদা।"

খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধুগণ উঠিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। লালমাধব উপহারের জিনিসগুলি আনাইয়া, কোন হাঁড়িতে কি আছে, তাহা নবীনকে বলিলেন। নবীন হাসিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "এ সকল জিনিস কি জন্যে এখানে ব'য়ে এনেছেন? আমার কি আর নারকেলের নাড়ু খাবার বয়স আছে? আর এখানে দ্বারভাঙ্গার আমের উৎকৃষ্ট আমসত্ত্ব, মাখন-গলানো ঘি যথেষ্ট পাওয়া যায়। কষ্ট ক'রে এ সকল জিনিস বাড়ী থেকে বয়ে আনবার কোনও দরকার ছিল না।"

লালমাধব কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "তোমার বৌদি দিয়েছেন, আমার কোনও দোষ নাই।"

নবীন বলিল, "বৌদি বোধ হয় আমাকে এখনও তেমনই ছেলেমানুষ মনে করেন ! তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাস্‌তেন, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি। তিনি ভাল আছেন ত ?"

লালমাধব বলিলেন, "হাঁ আছে, একবার তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে তার বড় আগ্রহ।"

নবীন বলিল, "সেটা স্বাভাবিক ; কিন্তু কি করে তাঁর আগ্রহ মিটাই ?—আমার ভয়ানক ডিসপেপ্‌সিয়া', পাড়াগাঁয়ে গিয়ে তাঁকে দেখ্‌বার মত আমার 'হেল্‌থে'র অবস্থা নয়।"

ইন্দুমাধব তাঁহার পিতার কানে কানে বলিল, "কাকীমাকে একবার দেখ্‌বো।"

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "ও বলে কি ?"

লালমাধব বলিলেন, "ও বল্‌ছে—কাকীমাকে একবার দেখবে।"

নবীন বলিল, "তা কাল দেখা হবে ; তার শরীর ভাল নয়, বোধ হয় শুয়ে পড়েছে ; রাত্রে আর দেখা করবার সুবিধা হবে না।"

কাকার কথা শুনিয়া বালক ক্ষুণ্ণ হইল।—উভয় ভ্রাতার আর অধিক কথা হইল না। নবীনমাধবের মাথা ধরিয়াছিল, সে দাদার নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিল।—অধিক রাত্রে পাচক বাহিরের একটা কুঠুরীতে দু'জনের ভাত দিয়া গেল। লালমাধব সপুত্র আহার করিযা বহির্ব্বাটীতেই শয়ন করিলেন। বালক পথশ্রমে কাতর হইয়াছিল, সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল ; কিন্তু লালমাধব অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিলেন না ; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কেন আসিলাম ? এ ত সে নবীন নয় !—তবু ত আমি তার দাদা !"

অন্তঃপুরে সুকুমারী পূর্ব্বেই ভাসুর ও ভাসুরপুত্রের আগমন-সংবাদ পাইয়াছিল। স্বামীকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দেশ থেকে কারা না কি এসেছে শুন্‌চি ?"

নবীন বলিল, "হাঁ, দাদা ছেলে নিয়ে এখানে এসেছেন। বুড়ো হলে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায় !"

সুকুমারী বলিল, "কেন ? চাক্‌রী-বাক্‌রীর উমেদারীতে এলেন না কি ?"

নবীন বলিল, "না, অনেক দিন আমাকে দেখেন নি, তাই শুন্‌লুম, দেখ্‌তে এসেছেন।"

সুকুমারী বলিল, "তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম—কিছু মতলব আছে। এসেছেন, আজ থাকুন ; কাল খাইয়ে-দাইয়ে ওদের বিদেয় করে দিও। তোমার দাদার পরিচয় পেলে তোমার উপর লোকের ভক্তি চটে যেতে পারে। 'অজ্ঞ'

পাড়া-গেঁয়েদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি ?—আমি ভাবছি, ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে না যান ।"

ঠিক সেই সময় লালমাধব করতলে মস্তক রাখিয়া ভাবিতেছিলেন, "এই কি আমার সেই ভাই ! এতকাল পরে উপযাচক হয়ে দেখা করতে এলাম, একটা কুশলবার্ত্তাও জিজ্ঞাসা করিল না ? আমি গরীব, আমি পল্লীবাসী মূর্খ, কিন্তু আমি যে তার দাদা !"

হঠাৎ বহুকাল পূর্ব্বের এমনই এক ঘনঘোর বাদলের রাত্রি তাঁহার মনে পড়িল—যে রাত্রে তাঁহার পিতা শিশু নবীনকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন । সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময়ী জননীর কথা মনে পড়িল , স্বামী-স্ত্রীতে কত কষ্টে নবীনকে মানুষ করিয়াছেন—তাহাও মনে পড়িল ।—অশ্রুধারায় তাঁহার শীর্ণ গণ্ড সিক্ত হইল, এবং তাঁহার সহিত সহানুভূতি-প্রকাশের জন্যই বোধ হয়, আষাঢ়ের দিগন্তব্যাপী মেঘ চরাচর অন্ধকার করিয়া মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করিল ।

পঞ্চম স্তবক

দিদি

[১]

হরিশপুরের প্রাণবল্লভ ভট্টাচার্য্য কাঁচা-পাকা মাথা লইয়া পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে যখন দ্বিতীয় সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইলেন, তখন গ্রামের লোক দু দণ্ড সময় কাটাইবার একটা উপলক্ষ পাইল ; স্বদেশী আন্দোলন-তরঙ্গ পুলিসের গুঁতায় অদৃশ্য হইলে, হুজুগের অভাবে গ্রামস্থ ভদ্র-সমাজের পরিপাক কার্য্যের বড় ব্যাঘাত ঘটিতেছিল, সুতরাং 'নূতন কিছু পাইয়া' সহসা গ্রামে জীবনের চাঞ্চল্য অনুভূত হইল ; নব বর্ষার অবিরল ধারা-পাতে আতটপূর্ণ তড়াগ যেমন ভেকের অশ্রান্ত মকধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে, ক্ষুদ্র হরিশপুর গ্রামও কতকটা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইল। কয়েক দিন বেশ উৎসাহেই অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা গুড়ুকখোরের সময় কাটিল।

গৃহে পঞ্চদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা বর্ত্তমানেও পঞ্চাশ বৎসরেব বুড়ো বাপ গোঁফে কলপ ও মাথায সোলার টোপর দিয়া দ্বিতীয় সংসার আনিতে যান, হিন্দু পরিবারে একপ দৃষ্টান্ত এখনও বিবল নহে। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশযকে এত বড় সৎসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া গ্রামের লোক কেন যে এত কলবর আরম্ভ করিল, তাহা তাহারাই বলিতে পারে ; বোধ হয হাতে কোনও কাজ না থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে ! প্রাণবল্লভ পণ্ডিত লোক, তিনি 'হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য' নামক একটি সুযুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়া সনাতনপুরের 'ব্রহ্মচর্য্য সভা' হইতে সুবর্ণপদক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, এবং প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু-শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া 'ভারত-গৌরব' নামক মাসিকপত্রে "হায় কি সর্ব্বনাশ !" শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সমালোচক গঙ্গাচরণ বাপান্তবাগীশ সেই প্রবন্ধের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "উদভ্রান্ত-প্রেম প্রকাশিত হইবার পর, একপ হৃদয়বিদারক মর্ম্মোচ্ছ্বাস বঙ্গ-সাহিত্যে গদ্যে পদ্যে আর কখনও কাহারও লেখনী-মুখে প্রকাশিত হয নাই।" কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে পত্নী-বিয়োগের পর তিন মাস না যাইতেই ভট্টাচার্য্যের ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিল ! ফুলকুমারী প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় তাঁহার অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিল।

বন্ধু দুর্গাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাযা হে ! এ তোমার কেমন প্রবৃত্তি ? ঘরে

তোমার দুধের মেয়ে বিধবা, একাদশীর দিন এক বিন্দু জলের জন্য হাহাকার করবে ; আর তুমি কোন আক্কেলে এই 'বুড়ো বয়সে চুড়ো কর্ম্ম' করলে ? ছিঃ !"

প্রাণবল্লভ কলপ-কপিশ গোঁফে অঙ্গুলিচালনা করিয়া একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, "'প্রর্ব্ব্যুত্তরেষা ভূতানাং',—কি করি বল ? যখন যেমন, তখন তেমন। ঘরে তিন বৎসরের মা-মরা কাঁচা ছেলে, কে তাকে কোলে-পিঠে নিয়ে মানুষ করবে, আর কেই-বা অসময়ে আমার সেবা-শুশ্রূষা করে ? বিশেষতঃ বিধবা মেয়েটার রক্ষণাবেক্ষণেরও ত একটা লোক চাই। সংসার ছেড়ে যখন বনে যেতে পারচিনে, তখন বুঝতে পারচো কি না ; আর শাস্ত্রেও ত এ ব্যবস্থা আছে—'মাতা যস্য গৃহে নাস্তি'—।"

দুর্গাশঙ্কর বলিলেন, "'অরণ্যং তেন গন্তব্যং'—তোমার বনে যাওয়াই উচিত ছিল।"

প্রাণবল্লভ বলিলেন ভার্য্যা যদি অপ্রিয়বাদিনী হয়, তবে সেই ব্যবস্থাই বটে ; কিন্তু আমার দ্বিতীয় পক্ষের এই ব্রাহ্মণীটির কথাগুলি অমৃততুল্য।"

বন্ধু বলিলেন, "অমৃতং বাল-ভাষিতম।"

[২]

পরহিতব্রত প্রাণবল্লভ হরিশপুরের তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুলতলা গ্রামের ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী নামক একটি কন্যাদায়গ্রস্ত নিরুপায় বৃদ্ধকে কন্যা-দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য লাল চেলী পরিয়া ও অভ্রভূষিত সোলার টোপর মাথায় দিয়া শ্রাবণের ঘনঘটাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে যে দিন শুভযাত্রা করেন, সে দিন অভ্যাগতা রমণীগণ মঙ্গল-শঙ্খ-ধ্বনিতে তাঁহার গৃহ পূর্ণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিধবা কন্যা মাতৃহীনা নিরুপমা সে দিন কোনও মতে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না। নিরুপমা তাহার তিন বৎসরের ভাই সুধীরকুমারকে কোলে লইয়া অন্দরের বাগানে একটি পল্লববহুল পেয়ারা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল ; পাছে কেহ তাহাকে এই শুভদিনে 'চোখের জল' ফেলিতে দেখিয়া তিরস্কার করে, এই ভয়ে সে লুকাইয়া কাঁদিল ! এই পেয়ারা গাছটি তাহার মা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রোপণ করিয়াছিলেন। এখন সেই গাছ শাখা-পত্রে, ফুলে-ফলে পূর্ণ ; বর্ষাসুলভ রাশি রাশি সুপক্ক পেয়ারা পক্ষি-চঞ্চুবিদ্ধ হইয়া অযত্নে বৃক্ষ-মূলে পড়িয়া আছে ; মা সেই গাছের পেয়ারা পাড়িয়া কতদিন নিরুপমাকে খাইতে দিয়াছেন। মাতৃ-হস্ত-রোপিত বৃক্ষটি সেইখানেই আছে, পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারও রাশি রাশি ফলের ভারে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ; কিন্তু

আজ সেই স্নেহময়ী জননী কোথায় ? সমস্ত জীবনটাই তাহার নিকট স্বপ্ন মনে হইতে লাগিল। নিরুপমার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমাকে তুমি ফেলিয়া গেলে কেন ? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।"--নিরুপমা ভাইটিকে বুকে লইয়া পেয়ারাতলায় বসিয়া পড়িল। তাহার মাথার উপর পেয়ারা গাছের শাখায় শাখায় ছাতারে ও বুল্‌বুলের দল অর্থহীন ভাষায় কাকলী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুধীরের বয়স তিন বৎসর মাত্র, সংসারে সে মা-ভিন্ন আর কাহাকেও চিনিত না ; মাকে হারাইয়া তাহার কি কষ্ট, তাহা সে-ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে ? এই তিন মাসের মধ্যেই তাহার আকৃতির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, তাহার মা যদি দৈব-বলে পুনর্জীবন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন, তবে নিজের ছেলেকে তিনিও চিনিতে পারিতেন না ! সুধীরের মুখে হাসি নাই, চক্ষু বসিয়া গিযাছে, মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শিশুর হৃদয় জননীর স্তন্যপানেব জন্য নিরন্তর হাহাকার করিতেছে ; তাহার বুকেব হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; চুলগুলি রুক্ষ, সর্ব্বাঙ্গে ময়লা পড়িয়াছে। সংসারে নিরুপমা ভিন্ন তাহার মুখের দিকে চাহিবার আর কেহ নাই। মায়েব মৃত্যুশয্যা হইতে নিরুপমা যেদিন তাহার ভাইটিকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল, সেই দিন হইতেই সে তাহাব মায়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু সংসারে মায়ের অভাব কে পূর্ণ করিতে পারে ?

[৩]

প্রাণবল্লভের দ্বিতীয় সংসার ফুলকুমারী তাঁহার গৃহে আসিযা নিজের অধিকার বুঝিয়া লইল। সে দরিদ্রের কন্যা, অল্প বয়সেই গহস্থালীর কাজকর্ম্মে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল ; সে বুঝিয়াছিল, সে-ই এ সংসারের কর্ত্রী ; সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে নিরুপমার সকল কাজেই 'খুঁত' ধরিতে লাগিল। নিরুপমা দুই চারি দিনেই বুঝিতে পারিল তাহার পিতার গৃহে অধিক দিন বাস করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু সংসারে তাহার আর স্থান কোথায় ? ছোট ভাইটিকে লইয়া সে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ?—নিরুপমা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল।

ফুলকুমারীর পিতৃগৃহে অশন-বসনের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে কোনও প্রকারে দেহ ও লজ্জা রক্ষিত হইত ; সে স্বামিগৃহে আসিয়া দেখিল, সংসারে বাজে খরচ বিস্তর ! প্রথম বাজে খরচ, দুগ্ধ। নিস্তারিণী গোষাণী সুধীরের জন্য দুই সের দুধের যোগান দিত ; দুই সেরে তিন পোয়া দুধ ও পাঁচ পোয়া জল

থাকিত। প্রাণবল্লভও তাহা জানিতেন, কিন্তু তিনি নিস্তারিণীর যোগান বন্ধ করিতে পারিতেন না ; কারণ, সে আশ্বিন মাসের প্রাপ্য টাকা চৈত্র মাসে না পাইলেও টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিত না। প্রাণবল্লভ যদি কোনও দিন বলিতেন,—"নিস্তারিণী, তোর দুধ যে দিন-দিন জলের চেয়েও পাতলা হচ্ছে।" তাহা হইলে নিস্তারিণী নথ নাড়িয়া জবাব দিত, "ও কথা বল্‌বেন না দাদাঠাকুর! দেনা ক'রে দুধের ব্যবসা চালাচ্ছি, সুদের টাকা কি ঘর থেকে দেব ?"

যাহা হউক, এই বাজে খরচটা কিরূপে বন্ধ করা যায়, ফুলকুমারী দিনকত তাহাই ভাবিল ; কিন্তু কি করিয়া কথাটা পাড়িবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে একটা সুবিধা হইল। সুধীরের এক দিন পেটের অসুখ হইল। ফুলকুমারী প্রাণবল্লভকে বলিল, "ছেলেটার সর্ব্বদা ব্যামো লেগে থাকে কেন তা বুঝি টের পাও না ? ঐটুকু ছেলে দু' সের দুধ খায়! এত দুধ ওর পেটে হজম হবে কেন ? আমি নিস্তারিণীকে বলে' দেব, এখন থেকে সে যেন এক সের দুধ দেয়। এত বড় ধেড়ে ছেলে একটা ভাত মুখে দেবে না! ভাত না খেলে কি ছেলেপুলের ধাত পুষ্ট হয় ?"

দ্বিতীয় পক্ষ তাঁহার প্রথম পক্ষের গর্ভজাত সন্তানের মঙ্গল-কামনায় এতখানি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া প্রাণবল্লভের প্রাণে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রাণবল্লভের দরিদ্রা প্রতিবেশিনী ও বিনামূল্যে উপদেশদাত্রী সর্ব্বাণী ঠাকুরাণী সুযোগ বুঝিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "নতুন বৌ কালে পাকা গিন্নী হবে, কেমন মায়ের মেয়ে!"

সুধীরের পেটের অসুখ সারিয়া গেল, কিন্তু তাহার দুধের 'বরাদ্দ' বাড়িল না। সুধীরের দুধের যোগান কমিয়া গেল দেখিয়া নিরুপমার মনে কষ্টের সীমা রহিল না। তাহার শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল! মায়ের কথা মনে করিয়া সে কত কাঁদিল। নূতন মায়ের আদেশে পিতা দুধের ছেলের দুধ কমাইলেন ? মা বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কি ছেলের দুধ কমাইতে পারিতেন ? নিরুপমা অভিমান করিয়া দুই দিন পিতাকে কোনও কথা বলিল না।—তৃতীয় দিন প্রাণবল্লভ পাশার আড্ডা হইতে বাড়ী আসিলে নিরুপমা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ম্লানমুখে বলিল, "বাবা, দুধের ছেলে সুধীর, তার দুধের রোজ কমাইলে ? মায়ের দুধ পায় না, এক সের জলো দুধে কি তার পেট ভরে ?

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "তোর তো ভারি বুদ্ধি! ঐটুকু ছেলে, এক সেরের বেশী দুধ কি ওর পেটে সহ্য হয় ? তোর মা মনে করতো, কতকগুলো দুধ গিলোলেই ছেলে মোটা হয়! তুইও বুঝি সেই রকম মনে করিস্ ?"

নিরুপমা বিনাপ্রতিবাদে প্রস্থান করিল। পরদিন সে তাহার একটি অঙ্গুরী

বিক্রয় কবিয়া সেই অর্থে এক সের করিয়া দুধ কিনিয়া সুধীরকে খাওযাইতে লাগিল।

দুই তিন দিন পরে প্রাণবল্লভ শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বিধবা কন্যার ভোগ-লিপ্সা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে, সে গহনা বিক্রয় কবিয়া দুধ খাইতেছে। ইহার পর হয় ত লুকাইয়া মাছ খাইতে আরম্ভ কবিবে; তাহাব পর কি কি বিভ্রাট ঘটিতে পারে, এই দুশ্চিন্তায় রাত্রে প্রাণবল্লভেব নিদ্রা হইল না। গীতাব শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বাসনা হইতে ভ্রান্তি, ও ভ্রান্তি হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। নিরুপমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে, কবে তাহাব পতন হইবে, কে বলিতে পারে? প্রাণবল্লভ নিদারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া নিরুপমাব নারিকেল তেল মাখা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই দিন দ্বিতীয় পক্ষেব মনোবঞ্জনেব জন্য এক বোতল উৎকৃষ্ট 'ফুলেল তেল' আসিল।

দুই তিন দিন পবে প্রাণবল্লভ তাঁহাব বৈবাহিক—নিরুপমার শ্বশুব আদ্যনাথ বাবুকে লিখিলেন, "আপনি কিছু দিন পূর্ব্বে আপনাব পুত্রবধূকে লইয়া যাইবাব প্রস্তাব কবিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কাবণে সে সময় তাহাকে পাঠাইবার মত কবিতে পারি নাই, এবং সে মাতৃশোকে বড় কাতর ছিল বলিয়া তখন তাহাকে পাঠানও সঙ্গত মনে করি নাই।—বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সধবা হউক, বিধবা হউক, পতিগৃহই হিন্দু নারীব একমাত্র আশ্রয়। আপনি একটি দিন দেখাইয়া শ্রীমতীকে এখান হইতে লইয়া যাইবাব ব্যবস্থা কবিতে পাবেন।"

[৪]

নিরুপমা যে দিন শুনিতে পাইল, তাহার পিতা তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন; সেই দিন সে বুঝিতে পারিল, ইহাও তাহার নূতন মায়ের কীর্ত্তি, পিতৃগৃহে আর তাহার স্থান নাই! সে ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া অশ্রান্তভাবে রোদন করিল। তাহার মনের কষ্ট সে কাহার নিকট প্রকাশ করিবে? তেমন লোক সংসারে কেহ ছিল না। অন্য দিন সে দিনান্তে একবার ভাতের কাছে বসিত, সে দিন সে ভাতের কাছেও বসিল না। সে ভাবিতে লাগিল সুধীরকে ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীতে সে কি করিয়া বাস করিবে? সে চলিয়া গেলে কে সুধীরের মুখের দিকে চাহিবে? কে তাহাকে ক্ষুধার সময় খাইতে দিবে? অসুখ-বিসুখ হইলে কে তাহার শুশ্রূষা করিবে? মা সুধীরকে তাহার হস্তে সঁপিয়া গিয়াছেন, মায়ের ধন সে কাহাকে দিয়া যাইবে?—মায়ের শোক তাহার হাড়ে-হাড়ে বিঁধিয়াছিল, ছোট ভাইটিকে কোলে না পাইলে এই শোক সে সহ্য

কবিতে পারিত না। সুধীর তাহার একমাত্র অবলম্বন, বাল-বিধবার জীবনের একমাত্র বন্ধন। সে সুধীরকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। সে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, গাছতলায় বাস করিবে, এবং সুধীর যদি দিনান্তেও একবার তাহার কোলে উঠিযা তাহাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকে, তবে এ সকল কষ্ট সে প্রসন্ন মনে সহ্য করিবে।

নিরুপমা অবশেষে এক দিন সাহস করিয়া পিতাকে বলিল, "আমি এখন শ্বশুরবাড়ী যাব না।"

প্রাণবল্লভ বিস্মিত হইযা বলিলেন, "শ্বশুরবাড়ী যাবি নে কি রে! আমি আর ক' দিন আছি, তোকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? আমার অবাধ্য হ'তে চাস্, তোর এত সাহস?"

নিরুপমা অতিকষ্টে অশ্রু রুদ্ধ কবিয়া বলিল, "সুধীর একটু বড়-সড় না হলে আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না।"

প্রাণবল্লভ,ভট্টাচার্য্য মানুষ। রাগ হইলে তাঁহার কাছা খুলিয়া যাইত, এবং কথা বাধিত। তিনি কাছা আঁটিতে-আঁটিতে সক্রোধে বলিলেন, "তো-তো-তোর বাবা যাবে, তুই যাবিনে বল্লেই কি আমি শুনবো? আমি পাঁচ কাজে ব্যস্ত—থাকি, তু-তু-তুই একটা কে-কে-কেলেঙ্কারী না ক'রে আর ছাড়বিনে দেখ্‌ছি: সু-সু-সুধীবেব ভাবনা তো-তো-তোকে ভাব্‌তে হবে না। ৫ই বৈশাখ দিন হয়েছে, সে-সে-সেই দিন তোকে আলবাৎ যে-যে-যেতে হবে।

নিরুপমা আব কোনও কথা না কহিয়া ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল! দিদিকে নীরবে বোদন করিতে দেখিয়া সুধীব অনেকক্ষণ কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাব পব তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উভয় হস্তে তাহাব গলা জড়াইয়া ধবিয়া বলিল, "দিদি তুই কান্‌তিস যে!"

নিরুপমা অশ্রু মুছিয়া বলিল, "আমি আর এখানে থাকবো না,সুধী।"

সুধীর এমন অসম্ভব কথাটা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পাবিল না। তাহাদের এই বাড়ীটুকু ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও যে তাহার দিদির যাইবার স্থান আছে, ইহা তাহার কল্পনার অতীত! সে নির্ণিমেষ নেত্রে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, "কুতায় দাবি দিদি?"

নিরুপমা বলিল, "শ্বশুরবাড়ী।"

এতক্ষণ পবে সুধীরের মনে পড়িল, শ্বশুরবাড়ী নামক একটি স্থানের কথা সে গল্পে ও ছড়ায় শুনিয়াছে বটে; কিন্তু তাহাব দিদিকেও যে সেখানে যাইতে হয়—এ ধারণা তাহার ছিল না। সে অত্যন্ত কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে দিদির গলা সজোরে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর বলিল, "দিদি, আমি তোল্ তন্নে

দাব। আমি একানে কাল্ কাতে থাক্‌ব ?"

নিরুপমার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "কেন, নূতন মার কাছে থাকবে।"

সুধীর বলিল, "না, নূতন মা বালো বাতে না, আমি তোল্ তন্নে দাব, দিদি।"

নিরুপমা বলিল, "বাবা তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে দেবেন কেন ধন ? আমি চলে গেলে আমাকে ভুলে যাবে না ত ?"

সুধীর দিদির পিঠে কিল মারিয়া বলিল, "তুই আমাকে বালো বাতিত্ নে, আমি আল দুদ্ কাবো না।"

নিরুপমা সুধীরকে কোলে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন কবিল। তাহার অশ্রু সুধীরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল।

সুধীর অপরাধীব মত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "দিদি কাঁদিত নে, আমি দুদ্ কাবো।"

[৫]

ক্রমে বিদায়ের দিন আসিল। নিরুপমা পিতা ও বিমাতাকে প্রণাম কবিযা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পাল্কীতে উঠিতে গেল ; এমন সময় সুধীর তাহার নীলাম্বরী কাপড়খানি ও কাঠের ঘোড়াটা লইয়া ধূলি-ধূসবিত দেহে ছুটিয়া আসিল , কাপড় ও ঘোড়া দিদির প্যল্কীর ভিতব রাখিয়া দিদির উভয় জানু জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি আমি তোল্ তন্নে দাবো, আমাকে তোলে নে।"—সে নিরুপমার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিল।

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "আয় রে সুধীর, বিকেলে তোকে আমবাগানে নিযে যাব। বাগানে আম পেকেচে, খুব মিষ্টি আম ; অনেক করে' পেড়ে দেব।"

সুধীব সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল ; দিদির গলা জড়াইয়া ধবিয়া বলিল, "আমি আম তাইনে, দিদি বালো, আমি দিদিল ছশুলবালি দাবো।"

বেহারারা তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু সুধীর নিরুপমার কোল হইতে নামিল না।—প্রাণবল্লভ অবশেষে বলপূর্ব্বক সুধীরকে কন্যার ক্রোড় হইতে নামাইয়া লইলেন।

সুধীর হাত পা ছুড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নিরুপমা কোনও দিকে না চাহিযা বসনাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া পাল্কীতে উঠিল।—বেহারারা পাল্কী তুলিল।

সুধীর নিষ্ফল ক্রন্দনে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল, "দিদি, আমাকে নিয়ে দা ! ও দিদি, তোল্ পায়ে পলি, আমাকে নিয়ে দা, আমি তোল ছশুলবালি

দাবো ।"

প্রাণবল্লভ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চুপ কর দুষ্টু ছেলে ! যত বয়স হচ্ছে, তত দুষ্টুমী বাড়চে ! দিদি ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকবে, শ্বশুরবাড়ী যাবে না ?"

সুধীর পিতার তিরস্কারে কর্ণপাত না করিয়া, "দিদি গো, ও দিদি গা !" শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ।—কিন্তু তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনধ্বনি দিদির কর্ণে প্রবেশ করিল না । বেহারারা উচ্চ কলরব করিতে করিতে পাল্কী লইয়া তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল । নিরুপমা পাল্কীতে বসিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল । সে কাঁদিয়া বলিল, "সুধীর, ভাই রে ! আবার তোকে কত দিনে দেখ্‌তে পাব ?—তোকে ছেড়ে কি নিয়ে সেখানে থাক্‌বো ?" কেহ তাহার এ প্রশ্নের উত্তর দিল না । বেহারারা গ্রাম অতিক্রম করিয়া, পাল্কী কাঁধে লইয়া মেঠো পথ দিয়া ছুটিয়া চলিল । পথের দুই ধারে চষা জমী, ধানের ক্ষেত । বৈশাখী অপরাহ্নের উত্তপ্ত সমীরণ ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া হু-হু শব্দে বহিয়া নিরুপমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল । গ্রাম্য-কৃষকেরা 'নিড়ানি' দিয়া ধান্যক্ষেত্রের ঘাস নিড়াইতে-নিড়াইতে সমস্বরে গাহিতে লাগিল,—

"কি কোরে ছেড়ে তোরে থাক্‌বো রে বাপ্ নীলমণি !
ও তোর ক্ষুধা পেলে মুখে তুলে কে আর দেবে ক্ষীর ননী ?"

নিরুপমার মনে হইল, কৃষকের সেই গীতোচ্ছ্বাসে—তাহারই মনের বাসনা ও বেদনা ধ্বনিত হইতেছে ।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল । বৈশাখ মাস, বসন্তের অবসানে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পল্লী-প্রকৃতি অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল । গোধূলিধূলি ম্লান চন্দ্রিকা-পরিব্যাপ্ত ধূসর নভস্তল আচ্ছন্ন করিতেছিল, এবং উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে গ্রাম্যপথের প্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী হইতে জাম-মুকুলের ও নিম্বমঞ্জরীর সুমিষ্ট সৌরভ দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়া যাইতেছিল ।

[৬]

নিরুপমার পাল্কী অদৃশ্য হইলে সুধীর অনেকক্ষণ ঘরের রোয়াকে বসিয়া জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের দিকে হতাশ নয়নে চাহিয়া রহিল । চন্দ্রমণ্ডলে সে যেন মায়ের স্নেহানুরঞ্জিত মুখখানি দেখিতে পাইল । তাহার মনে পড়িল, দিদি তাহাকে বলিয়াছিল, "ঐখানে মা আছে ।"—তিনি একবার সেখানে হইতে

নামিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবেন না ?—মা গিয়াছেন, দিদিও চলিয়া গেল ! সে এখন কাহাব কাছে থাকিবে ?

রাত্রে পিতার শয্যাপ্রান্তে শয়ন করিয়া সুধীর দিদির জন্য কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল ; কিন্তু ঘুমাইয়াও সে দিদিকে ভুলিল না, স্বপ্নঘোবে বলিল, "দিদি, তোল পায়ে পলি, আমাকে তোলে নে, আমাল ভয় লাগ্‌তে ।"

প্রাণবল্লভের দ্বিতীয় পক্ষ বিরক্তিভরে বলিল, "নাঃ ছোঁড়াটা দেখ্‌চি আজ রাত্তিরে ঘুমোতে দেবে না ! কেবল—দিদি, দিদি ! এমন আবদেরে ছেলেও ত কখন দেখি নি ।"

ঠিক সেই সময়ে নিরুপমা তাহার শ্বশুরালয়ের একটি নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে জ্যোৎস্নালোকিত বহিঃপ্রকৃতিব দিকে চাহিয়া কাতরস্বরে বলিল, "সুধীর ভাই রে ! এখন তুই কোথায় ? তোর মুখখানি দেখ্‌তে না পেয়ে আমার বুক যে ফেটে গেল ।"

ষষ্ঠ স্তবক

মা

[১]

ভবসিন্ধু মায়ের একমাত্র পুত্র। মা একে-একে ফুলের মত ছয়টি শিশুকে যমের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন ; সুতরাং ভবসিন্ধুই তাঁহার অন্ধের নয়ন, খঞ্জের যষ্টি : তাঁহার আদরিণী কন্যা মন্দাকিনীকে তিনি সুপাত্রেই সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পনের বৎসর বয়সে মন্দাকিনী বিধবা হইল। সেই শোকানল নির্ব্বাপিত না হইতেই তাঁহার স্বামী করুণাসিন্ধু বাবু অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে এই আলোকপূর্ণ বসুন্ধরা সহসা তাঁহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সংসারে বিধবা কন্যা ও অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র ভবসিন্ধু ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না।

ভবসিন্ধুর পিতা করুণাসিন্ধু জমীদারের নায়েব ছিলেন। এরূপ সদাশয় ব্যক্তি জমীদারের নায়েবী করিতে পারেন, ইহা সহসা বিশ্বাস হয না। জমীদারের নায়েবী ও পুলিসের দারোগাগিরি অনেকটা একই রকম কাজ : ভালমানুষ নায়েবের লাঞ্ছনার সীমা নাই ; কিন্তু নায়েবী করিতে গিয়া করুণাসিন্ধুকে কখনও লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই ; জমীদার তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন ; প্রজারাও তাঁহাকে ভালবাসিত, পিতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ দেখিতেন. তাহাদের কোনও সঙ্গত আব্দার অগ্রাহ্য করিতেন না ; তাহাদের অনেক সঙ্গিন মামলা আপোষে মিটাইয়া দিতেন। জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার গুণের পরিচয পাইয়া তাঁহাকে অনরারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। করুণাসিন্ধু যখন চোগা-চাপকানে সজ্জিত হইয়া পাল্কী চড়িয়া মহকুমার কাছারীতে 'হাকিমী' করিতে যাইতেন. তখন দর্শকগণ মনে করিত, "হাঁ, হাকিম বটে!"—মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী রিয়াজুদ্দীন হক্‌কে তাঁহার দেহের তুলনায একটি মক্ষিকা বলিয়া মনে হইত।

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট করুণাসিন্ধুকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন ; অনেক বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। করুণাসিন্ধুও তাঁহার কাজ অনেকটা লঘু করিয়া তুলিয়াছিলেন ; এবং তাঁহারই অনুগ্রহে করুণাসিন্ধু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। করুণাসিন্ধু ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের অন্ততঃ বিশখানি গ্রামে 'নায়েব-হাকিম' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

জমীদারের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রজার মা বাপ, এমন নায়েব কখনও কিছু সঞ্চয়

করিতে পারেন না ; করুণাসিন্ধুও করুণাময় নাম ভিন্ন পৃথিবীতে কোনও সম্বল রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু এই সম্বলে দুঃস্থ বংশধরগণের দুঃখমোচন হয় না। মৃত্যুকালে তিনি পরিজনবর্গের ভরণপোষণোপযোগী কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ভবানীগঞ্জের প্রধান উকীল নৃত্যকালীর বাবুর কন্যা বিলাসিনীর সহিত পুত্র ভবসিন্ধুর বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন।—ভবসিন্ধু শ্বশুরের আশ্রয়ে থাকিয়া ভবানীগঞ্জের স্কুলে এন্ট্রেন্স পড়িত।

ছুটির সময় ভিন্ন ভবসিন্ধু বাড়ী আসিবার অবকাশ পাইত না। পিতার মৃত্যুর পর সে বাড়ীর সহিত সকল সম্বন্ধ এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। স্নেহের আকর্ষণ জীবনের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ, কিন্তু দীর্ঘকাল প্রবাসে অবস্থান হেতু ভবসিন্ধুর হৃদয়ের উপর জননীর স্নেহের আকর্ষণও ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহার অন্য কারণও ছিল : বাল্যকাল হতেই ভবসিন্ধু জননীর সংস্রবে আসে নাই, পিসীমাই বাল্যে তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন : সুতরাং পিসীমাকেই সে তাহার হৃদয়ে মায়ের আসনে বসাইয়াছিলেন। বিধবা পিসীমা ইহাতে হৃদয়ে কতকটা শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের উপেক্ষায় স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয় এক এক সময় ক্ষোভে ও অভিমানে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত ; তথাপি তিনি মনে করিতেন, "আমার ছেলে কি কখনও পর হবে ?"—পিসীমার মৃত্যুতে ভবসিন্ধু মায়ের অভাব অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু শ্বশুরালয়ের নূতন আকর্ষণে সে অল্পদিনেই সেই অভাব বিস্মৃত হইয়াছিল। নূতনত্বের মোহ তাহার হৃদয়ের ক্ষতের উপর প্রলেপের কার্য্য করিয়াছিল।

কিছুদিন শ্বশুরালয়ের আদর যত্নে 'জামাই বাবু' ভবসিন্ধুর মেজাজ একটু বদ্‌লাইল ; বিগড়াইল, এ কথা না বলিলেও অসঙ্কোচে বলিব, ভবসিন্ধু হঠাৎ আলোকগ্রস্থ হইয়া উঠিল ! সোনার চশমা না হইলে কিছুই দেখিতে পায় না, বৃদ্ধ পিতৃবন্ধুগণকে দেখিয়া শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক অবনত হয় না, বাল্যকালে সে যে-সকল চাষার ছেলের সঙ্গে 'হাডুডুডু', 'চামচু', 'লুকোচুরী' খেলা করিয়াছে, তাহাদের দেখিয়া এখন বলে, "কি নোংরা !—দেখলে আতঙ্ক হয় !" —এবং এই আতঙ্কনিবারণের জন্য সে স্বদেশী এসেন্স-বাসিত 'সিল্কের' রুমালে নাক ঢাকিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইত ; অথচ রবীন্দ্র বাবুর সেই স্বদেশী গানটি,—

"ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী।"

সর্ব্বদা তাহাকে গুণ্-গুণ্ করিয়া গায়িতে শুনা যাইত !

ভবানীগঞ্জের প্রধান উকীলের স্ত্রী যাহার শাশুড়ী—সে মায়ের কাঙ্গালিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে মায়ের প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদান করিতে পারিবে, এরূপ আশা

করা কিঞ্চিৎ অসঙ্গত। তথাপি প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হইলে, সে বন্ধুগণের বিদ্রূপে বিব্রত হইয়া কয়েক দিনের জন্য কাঙ্গালিনী মায়ের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিল। যে কয়েক দিন সে বাড়ীতে ছিল, সময় নাই, অবসর নাই,—সকল সময়েই মা তাহাকে 'এটা খাও' 'ওটা খাও' বলিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।—ভবসিন্ধু ভাবিল, "এখান হইতে পলাইতে পারিলেই বাঁচি।"

ইহার উপর আরও এক বিপদ। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিধবা মন্দাকিনী প্রবাসী ভাইটিকে এত দিন পরে দেখিতে পাইয়া তাহাকে যে কোথায় রাখিবে, কি দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না। সুমধুর ভ্রাতৃস্নেহে সেই স্নেহশীলা কোমলহৃদয়া বিধবার হৃদয় আদ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভ্রাতার স্নানের জলটুকু হইতে পানের চুণটুকু পর্য্যন্ত সকলই সে যথাস্থানে যথাসময়ে রাখিয়া দিত ; এবং ভবসিন্ধু তাহাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিলে তাহার শূন্য হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবসিন্ধু খাইতে বসিয়াছে, মা পাশে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে-করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা ভব, বৌমাকে বাড়ী না আন্‌লে আর চল্‌চে না। আমার পাঁচ নেই, সাত নেই ; ঐ একটি বৌ! বার মাস সে বাপের বাড়ী থাকে, এ কি ভাল দেখায়? কর্ত্তা বেঁচে থাক্‌লে তিনি কি এতদিন বৌমাকে বাপের বাড়ী রাখ্‌তেন? বেটা, বেটার বৌ নিয়ে ঘর করা আমার 'মনিষ্যি-জন্মের' সাধ!"—পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল।

ভবসিন্ধু গুড়-অম্বল দিয়া ভাত মাখিতে-মাখিতে বলিল, "তুমি ত বৌ আন্‌বার জন্যে ধূম লাগিয়েছ, বৌ এখানে এসে খাবে কি?"

মা অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন, "কর্ত্তা কিছু রেখে যেতে পারেন নি বটে, কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে দিন ত এক রকম করে কেটে যাচ্ছে। আমার যে দু'তোলা সোনা রূপো ছিল, তা বেচে বেচে এতদিন কাট্‌লো। তুমি আমার সাত রাজার ধন মাণিক, এত লেখা পড়া শিখেছ, দু'পয়সা আনতে পারলেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে। ভগবান চিরকাল কারও দুঃখকষ্ট রাখেন না।"

ভবসিন্ধু বলিল, "সে বড়লোকের মেয়ে, এখানকার কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে না : এখন তার আসা হবে-টবে না।"

মা অগত্যা নীরব রহিলেন। দারিদ্র্য-যন্ত্রণা আজ তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল।

[২]

আরও চারি বৎসর কাটিয়া গেল। সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ভবসিন্ধু এন্ট্রেস পাশ করিয়া তিনবার এল এ পরীক্ষা দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহার শ্বশুর নৃত্যকালী বাবু তাহাকে কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিতে পাঠাইয়াছিলেন ; পড়াশুনায় তাহার তেমন মনোযোগ ছিল না। সে রিপণ কলেজে পড়িত ; কলেজের সময়টুকু ভিন্ন দিবসের অন্য সময় সে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া ; দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বদেশবাসিগণের অন্নসংস্থানের জন্য চাঁদা তুলিয়া, ভলণ্টিয়ার দলের 'কাপ্তেনী' লইয়া, পাঠাভ্যাসের বড় অবসর পাইত না। মায়ের দুঃখ অপেক্ষা মাতৃভূমির দুঃখেই তাহার প্রাণ অধিক কাঁদিয়া উঠিত। নিজের ক্ষুদ্র পল্লীর কথা তাহার উদার হৃদয়ে স্থান পাইত না, বিশাল ভারতভূমির দুরবস্থার কথা ভাবিয়া সে দিন-দিন কাহিল হইতে লাগিল!—"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!" গায়িতে গায়িতে যখন সে চাঁদার খাতা লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইত, তখন জননীর আত্মত্যাগ, দিদির স্নেহ হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে না পারিলেও, জন্মভূমির উদ্ধারের জন্য শ্বশুরের কঠিন-পরিশ্রম-লব্ধ ঘর্ম্মসিক্ত অর্থরাশি নষ্ট করিতে তাহার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হইত না! বক্তৃতায় করতালি ও দেশোদ্ধার-ব্রতে অজস্র প্রশংসা লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদে তাহার বক্ষস্থল স্ফীত হইয়া উঠিত! দুঃখিনী মাতা অনাহারে প্রাণত্যাগ করুন, পৈত্রিক পল্লীতে পবিত্র পিতৃভবন শ্মশানে পরিণত হউক, দেশোদ্ধারের জন্য আত্মবিসর্জ্জন সে নিতান্ত আবশ্যক মনে করিল ; পরীক্ষায় পাশ ও বৈষয়িক জীবনের সাফল্য তাহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইতে লাগিল।

তথাপি নিরুদ্যম না হইয়া ভবসিন্ধু চতুর্থবার দুস্তর পরীক্ষা-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় ভব-রঙ্গমঞ্চ হইতে তাহার শ্বশুর নৃত্যকালী বাবুর ডাক পড়িল। তিনি উকীলের সামলা ফেলিয়া আর এক বিচারালয়ে সর্ব্বশক্তিমান বিচারপতির সম্মুখে জবাবদিহি করিতে চলিলেন! সেখানে আসামী, উকীল ও হাকিম, সকলেরই একত্র বিচার হয় ; কিন্তু সে বিচারালয় কোথায়, ইহজীবনে এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিল না।

নৃত্যকালীর মৃত্যুর পর ভবসিন্ধু তাঁহার পরিবারে বড় অশান্তিভোগ করিতে লাগিল। তাহার আদর যত্ন অক্ষুণ্ণ রহিল না ; তাহার আত্মমর্যাদা পদে-পদে আহত হইতে লাগিল। নৃত্যকালী বাবুর স্ত্রী তাঁহার পৌত্রগণের অপেক্ষা দৌহিত্রের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেন। নৃত্যকালী যতদিন জীবিত

ছিলেন, ততদিন কেহ তাঁহার কার্য্যে অসন্তোষ-প্রকাশে সাহসী হয় নাই ; কিন্তু এতদিনে সংসারে আগুন জ্বলিয়া উঠিল ! পুত্রবধূগণের সহিত কন্যার দারুণ মনান্তর উপস্থিত হইল। ভবসিন্ধুও 'নিষ্কর্ম্মা', 'ভেতুড়ে' প্রভৃতি কঠোর মন্তব্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না। ভবসিন্ধু সহসা বুঝিতে পারিল, দেশোদ্ধার অপেক্ষা আত্মরক্ষার আবশ্যক অধিক । সংসারের চিন্তা ছাড়িয়া যাহারা দেশোদ্ধারের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া উঠে, সংসার তাহাদের পারিবারিক অভাবকে উপেক্ষা করিয়া চলে না।

ইতিমধ্যে মদনগঞ্জের মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইল ; উমেদার ভবসিন্ধু দরখাস্ত হস্তে স্কুলের সেক্রেটারী বামাপদ বাবুর দ্বারস্থ হইল ; বামাপদ নৃত্যকালীর পুরাতন মক্কেল ও সুহৃদ্ ছিলেন ; বন্ধুর জামাতার দুরবস্থার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল , এল-এ পাশ ও বি-এ ফেল উমেদারগণের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ভবসিন্ধুকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন ; ভবসিন্ধুর স্বদেশ প্রেমের নদীতে ভাটা পড়িল। দুষ্কর স্বদেশী ব্রত ও সরকারের সাহায্য-পুষ্ট বিদ্যালয়ের মাষ্টারী—শ্যাম ও কুল, উভয়ই রক্ষা করা একালে অনেকেরই পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ! ভবসিন্ধু শ্যামের মধুর বংশীরবে কর্ণপাত না করিয়া কুল-রক্ষায় মনঃসংযোগ করিল।

মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরী করিয়া একালে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা বড় কঠিন ব্যাপার। ভবসিন্ধু স্কুল-বোর্ডিং-এর অধ্যক্ষতা-ভার গ্রহণ করায় খোরাকটা বাঁচিয়া গেল ! এদিকে বিলাসিনী বাপের বাড়ীতে আর তিষ্টিতে পারিল না ; পদে-পদে ভ্রাতৃবধূগণের গঞ্জনায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। তখন শীতকালে দরিদ্রের একমাত্র সম্বল জীর্ণ কাঁথার ন্যায় শ্বশুরবাড়ীর কথা তাহার মনে পড়িল। পঁচিশ টাকার উপর নির্ভর করিয়াই ভবসিন্ধু স্ত্রী-পুত্রকে বাড়ী রাখিয়া আসিল। সে সেই অল্প বেতনে তাহাদিগকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইতে সাহস করিল না।

এত কাল পরে পুত্রবধূ ও পৌত্রকে পাইয়া ভবসিন্ধুর মাতা যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। মন্দাকিনীও এত দিন পরে সংসারযাত্রার একটা অবলম্বন পাইল ; কিন্তু শ্বশুর বাড়ী আসিয়া বিলাসিনী বড়ই বিপদে পড়িল। বিবাহের পর সে কয়েক দিনের জন্য একবারমাত্র শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিল। পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। শাশুড়ী ও ননদের সহিত কি করিয়া মিলিয়া-মিশিয়া সংসার করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা ছিল না। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়,—বিলাসিনীর অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়া উঠিল ! শাশুড়ী ননদের স্নেহের বন্ধনে তাহার আত্মাভিমানস্ফীত আত্মসুখান্বেষী হৃদয় আবদ্ধ হইল না ;

সে তাঁহাদের আদর যত্নের মধ্যেও নিত্য সহস্র ত্রুটি আবিষ্কার করিতে লাগিল। শাশুড়ী যথাসাধ্য পরিশ্রমে ও যত্নে তাহার সকল অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেন ; মন্দাকিনী তাহার স্নানের জল তুলিয়া দিত : তাহার কাপড় কাচিত : তাহার শয়নকক্ষ পরিষ্কার কবিত ; তাহার এঁটো-কাঁটা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিত ! ইহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাক্—বিলাসিনী তাহাকে দাসীর ন্যায় উপেক্ষার চক্ষে দেখিত ! সে ভবানীগঞ্জের সর্ব্বপ্রধান উকীলের কন্যা ; মলিন-বস্ত্রপরিহিতা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা-স্বরূপিনী ভাগ্যহীনা মন্দাকিনীকে সে কি করিয়া তাহার সমকক্ষ মনে করিবে ? দরিদ্রা শাশুড়ীকেই বা কি কবিয়া সে তাহার মাতৃস্থানীয়া মনে করিবে ? দীর্ঘকালেও তাঁহাদের সহিত তাহার মনের মিল হইল না। তাহার মনে হইত, ইহারা উভয়েই অনাবশ্যক উপসর্গমাত্র, বসিয়া-বসিয়া তাহার স্বামীর কষ্টার্জ্জিত অন্ন ধ্বংস করিতেছে। এই বাজে খরচ না থাকিলে সংবৎসরের মধ্যে তাহার দু'খানি নূতন গহনা হইতে পারিত।

কিন্তু শিশু ও দেবতার নিকট পাত্রাপাত্রের ভেদ জ্ঞান নেই। তাঁহারা অসঙ্কোচে সকল ভক্তের পূজাই গ্রহণ করেন। ভবসিন্ধুর পুত্র গুণসিন্ধুর বয়স সবে দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র, এখনও সে সকল কথা স্পষ্ট বলিতে পারে না ; কিন্তু ঠাকুরমা তাহাকে কত ভালবাসেন, তাহা সে অতি অল্প দিনেই বুঝিতে পারিয়াছিল। যে সংস্কারবলে ভূমিষ্ট হইয়া মাতৃস্তন্য আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল, সেই ভগবদ্দত্ত-সংস্কার-বলেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল, পিতামহীর স্নেহে তাহার জন্মগত অধিকার আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে তাহার পিতামহীর একান্ত অনুগত হইয়া উঠিল ! 'ঠাকুরমা' না হইলে তাহার চলিত না।—ঠাকুরমা তাহাকে খাওয়াইয়া না দিলে তাহার ক্ষুধা দূর হইত না, এবং তিনি তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া না দিলে তাহার ঘুম আসিত না।

[৩]

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'গোবিন্দ সামন্ত' লিখিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই মেয়েদের স্নানের ঘাটে 'মেয়ে-পার্লিয়ামেন্ট' বসিয়া আসিতেছে। রূপাঘাটায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবার কোনও কারণ ছিল না। একদিন রূপাঘাটার সেই 'মেয়ে-পার্লিয়ামেণ্টে' বিলাসিনীব কথা উঠিল। নিস্তারিণী ঠাকুরাণী গ্রামের 'গেজেট' ; গ্রামের সকল গুপ্ত সংবাদ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কর্ণগোচর হইত, এবং তিনিই তাহা শাখাপল্লবে, পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করিয়া গৃহে-গৃহে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি আবক্ষমগ্না হইয়া একখানি সুরঞ্জিত তারকেশ্বরের

গামছায় গাত্রমার্জ্জনা করিতে-করিতে দত্তদের বিধুমুখীকে বলিলেন, "আর শুনেছিস্ বিধু, ও পাড়ার ভবর বৌর আক্কেলখানার কথা ? আমি ত বোন, অবাক হয়ে গিয়েছি ! ঘোর কলি কি না ? হলেই-বা না হয় তুমি পয়সাওয়ালা উকীলের মেয়ে, তাই ব'লে কি বুড়ো শাশুড়ীকে 'দিবে রাত্তি'র দাসী-বাঁদীর মত খাটিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় ? আব মন্দা ছুঁড়ীরই বা কি কষ্ট ! বৌ নাইবেন, জল তুল্‌বে মন্দাকিনী ; বৌ ভাত খাবেন, এঁটো ফেল্‌বে মন্দাকিনী ; বৌ 'আকাচা' কাপড ছেড়ে রাখ্‌বেন, মন্দাকিনী তা কেচে শুকোতে দেবে। মন্দা যেন ওঁর কেনা দাসী !"

বিধুমুখী ঘুঁটের ছাই-দিয়া দাঁত মাজিতে-মাজিতে বলিল, "ওদেব কথাই আলাদা ; ছেড়ে দাও ওদেব কথা ! ঘোর কলি না হ'লে কি এমন হয় ? ওঁরা না কি আবার 'নেকাপড়া' শিখেছে, ঝাঁটা মারো অমন নেকাপড়ার মুখে ! মাগী বড় আশা ক'রে বড় ঘরে ছেলেব বিয়ে দিয়েছিল ; এখন নাকের জলে 'চোকের' জলে এক হচ্ছে ! বেটার বৌর জন্যে পাগল , কবে বৌ আস্‌বে, কবে সংসাব-ধম্ম কববে,—ভেবে মাগী 'মালা ফিরোবার' সময় পেত না। তার পর এমন বৌ এসে ঘাড়ে পড়লো যে,—ঐ দেখ মন্দা নাইতে আস্‌ছে,—দবকার কি দিদি পরের কথায় ?"

মন্দাকিনী জলে নামিল। বিধুমুখী জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো মন্দা, বৌ ঘাটে আসে নি ?"

মন্দাকিনী বলিল. "না. বৌর ঘাটে নাওয়া সয় না। জল গরম করে রেখে এসেছি. বাড়ীতে 'ছ্যান' করবে।"

নিস্তারিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "বৌ কি একটু নড়ে' বসে না ? পাড়াগাঁয়ে এমন বিবিয়ানা ত শোভা পায় না ! বাপেব বাড়ী যা সাজে, শ্বশুববাড়ী তা সাজে না . এখানে ত পাঁচটা দাসী বাঁদী নেই।"

মন্দাকিনী বলিল, "আমরা ত আছি ! দেখ ঠাক্‌রুণ. বৌ যদি দু'দণ্ড হেসে কথা বল্‌তো. তা হলেও বুঝ্‌তাম—আমাদের 'ছেরম্' সাত্‌থক ; খাটুনি কিছু হাতে লেগে থাকে না। তা এত করেও, কোন দিন যদি বৌর মন পেলাম , দিবেরাত্তির মুখ বিষ ! মাকেও কি দুটি ভাল 'বাক্যি' বলা আছে ? মার খুব সহ্যগুণ, তা না হ'লে এতদিন কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড বাধতো !"

বিধুমুখী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা বটে ; তোর মার মত লক্ষ্মী এ কলিতে দেখা যায না। কি অদেষ্ট নিয়েই যে সংসারে এসেছিল, দাসীগিরি করতে করতেই জীবনটা গেল !"

নিস্তাবিণী বলিলেন. "এমন শাশুড়ীকেও ভক্তি করে না ?"

মন্দাকিনী বলিল, "হাঁ—ভক্তি করবে! বৌ ভবকেই বড় মানে, তা মাকে মান্‌বে! ভব মাসে কুড়িটি ক'রে টাকা পাঠায়, বৌ হাতে ক'রে তা খরচপত্র করে, মা তার মধ্যে নেই। দ্বাদশীর দিন এক পয়সার গুড় আনাতে হ'লে মা নিজে থেকে পয়সাটি দেন। বৌ একবারও মনে করে না—এরা মায়েঝিয়ে একাদশী করে আছে, দ্বাদশীর দিন দুটো-একটা পয়সার জলখাবার আনিয়ে দেওয়া দরকার; ওদিকে হাবার মাকে দিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে সন্দেশ মিঠাই আনানোর বেলা খরচে টানাটানি পড়ে না! ভাগ্যে মার হাতে দু'পয়সা ছিল, তাই কোন রকমে আমাদের জাত রক্ষা হচ্ছে।"

বিলাসিনীর চরিত্র-সমালোচনা শেষ হইলে পল্লীরমণীগণ স্নানান্তে গৃহে ফিরিলেন।

মন্দাকিনী বলিল, "বৌ যেন এ সবকথা শুনতে না পায়, তা হ'লে অনর্থ বাধাবে, বাকি-যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বাঁচবে না; মার কাছেও গাল খাব। মা পর্য্যন্ত বৌকে ভয় করে চলেন!"

নিস্তারিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "ভয় না করে উপায় কি? চাক্‌রে ছেলের বৌ, ভয় করতেই হয়। আমাদের তেমন মুখ নয় মা! আমাদের মুখের কথা কাক-পক্ষীতেও শুনতে পায় না।"

[৪]

কাক-পক্ষীতেও যে কথা শুনিতে না পায়, সে কথা অলকা নাপ্‌তিনীর কর্ণে প্রবেশ করে। পল্লীরমণীগণের মধ্যে যখন বিলাসিনীর চরিত্র-সমালোচনা চলিতেছিল, সেই সময় অলকা স্নানের ঘাটে কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া বালি দিয়া ঘড়া মাজিতেছিল। বলা বাহুল্য, সকল কথাই সে শুনিয়াছিল। সেই দিন অপরাহ্ণে বিলাসিনীকে আল্‌তা পরাইতে আসিয়া সে সেই সকল কথা সালঙ্কারে বিলাসিনীর গোচর করিল। অলকার যে ইহাতে কোনও লাভ ছিল, এমন নহে; তবে একজনের কথা আর একজনকে 'লাগানো' তাহার স্বভাব; না বলিতে পারিলে তাহার পেট ফুলিত!

বিলাসিনী আল্‌তা পরিল বটে, কিন্তু তাহার ক্রোধ ও অভিমানের সীমা রহিল না। শাশুড়ী সন্ধ্যাকালে ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে বসিয়াছিলেন; বিলাসিনী রাগে গর-গর করিতে-করিতে তাঁহার কাছে আসিল, এবং তাঁহার ক্রোড় হইতে ছেলেকে টানিয়া লইয়া তাহার দুই ডানা ধরিয়া হাতে ঝুলাইতে-ঝুলাইতে নিজের কক্ষে লইয়া গেল।

বধূর ভাব দেখিয়া শাশুড়ী দুধের বাটী সম্মুখে লইয়া কিছুকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। যদিও বিলাসিনীর মুখ অষ্টপ্রহর কাল-বৈশাখীর অপরাহ্নের মত অপ্রসন্ন থাকিত, তবু তিনি সহসা এরূপ 'সাইক্লোনে'র কারণ কি, কল্পনা করিতে পারিলেন না। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্দা, কি হয়েছে রে?"

মন্দাকিনী কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু হয় না কি?—কি হয়েছে, তা তোমার 'গুণধর' বৌকেই জিজ্ঞাসা কর।"

নিরভিমানিনী শাশুড়ী বৌর ঘরের দিকে চলিলেন। "গুণি" মেঝেতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল; ঠাকুমার ক্রোড় হইতে তাহাকে ছিনিয়া লইয়া যাওয়ায় তাহার বড় দুঃখ হইয়াছিল। সে সহজে দুধ খাইত না, ঠাকুরমা তাহাকে ভুলাইয়া একটু দুধ খাওয়াইবার জন্য সবেমাত্র গল্প আরম্ভ করিয়াছিলেন,—'এক যে ছিল রাজা'—।

নাতি ঠাকুরমাকে সম্মুখে দেখিয়া ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া বসিল, তাঁহার ক্রোড়ে যাইবার জন্য দুটি হাত বাড়াইয়া বলিল, "তাকুমা, আমি আজাব গপ্‌পো ছুনবো। আমাকে নিয়ে তল, মা আমাকে মেলেতে।"

বিলাসিনী সকোপে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা মেরে ত আর কিছু রাখে নি। মা শত্তুর কি না, লক্ষ্মীছাড়া মিথ্যেবাদী ছেলে! আমার নামে তুই ঠকামো করছিস, আমি কি কাকেও ভয় করি?"

শাশুড়ী বুঝিলেন, কথাটা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "তুমি আবার কাকে ভয় করবে বৌমা? ভয় করবার কথা ত কিছু হয় নি। ভবকে আমি বিস্তর কষ্ট করে মানুষ করেছি, গুণি তারই ছেলে: আমি ওকে দুধ খাওয়াতে বসেছিলাম, তুমি রাগ করে আমার কোল থেকে ওকে টেনে নিয়ে এলে!—হয়েছে কি?"

বিলাসিনী বলিল, "না হয়েছে কি? তোমরা মায়ে-ঝিয়ে লেগেছ; যদি আমি তোমাদের এতই ভার হয়ে থাকি, তবে আমার গলায় ছুরি দিলেই পার; এমন করে দগ্ধে মারা কেন? ঘাটে পথে পরের বৌ-ঝিরে ধ'রে তাদের কাছে আমার এত 'কুচ্ছ' করাই বা কেন? আমার জন্যে আর ভাত রেঁধেও কাজ নেই, আমার ছেলেকে ভালবেসে দুধ খাইয়েও দরকার নেই! খোঁটা খেতে-খেতে আমার প্রাণটা ঝালাপালা হয়ে গেল! এত লোক মরচে, আমার মরণ হয় না?"

বিলাসিনীর এই আনুনাসিক বিলাপে গৃহিণী কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর সংযত স্বরে বলিলেন, "বৌমা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমার মনে কষ্ট দেব, এ কথা তোমার মনে করাই অন্যায়। সংসারে কি আমার কোনও কাজ নেই, পথে-ঘাটে তোমার নিন্দে কুচ্ছো করে বেড়াব? তোমার

ছেলেকে যদি কোলে-পিঠে করে মানুষ না করবো, ত কোন্ পরের ছেলেকে আদর যত্ন করতে যাব ? ছি মা, তোমার বড় অল্প বুদ্ধি।"

বিলাসিনীর ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, আমার বড় অল্প বুদ্ধি, আর তোমাদের বড় 'ভাবিক্কে' বুদ্ধি, তাই তোমার মেয়ে দু'বেলা দু'মুটো ভাত রেঁধে দিয়ে যার-না-তার কাছে আমার কুচ্ছো গেয়ে বেড়ায়। আমার ত দু'টো কান আছে, সব কথা শুনতে পাই। অমন ভাত না রাঁধলেই হয় ?"

গৃহিণী দেখিলেন, কথাতেই কথা বাড়ে, সুতরাং চাপিয়া যাওয়াই ভাল ; কিন্তু ব্যাপাব কি, তখনও পরিষ্কার বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কন্যা মন্দাকিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে মন্দা ! তুই ঘাটে-পথে বৌমার কথা কাকে কি বলেছিস ?"

মন্দাকিনীর উভয় হস্তেব দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার দুই চক্ষু স্পর্শ করিয়া বলিল, "দু'টি চোখের মাথা খাই যদি মন্দ কিছু বলে থাকি। ও পাড়ায় বিধু ঠাকুরঝি আজ ঘাটে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, বৌ ঘাটে আসে নি কেন ? আমি বললাম, বৌর শরীর ভাল নয়, আমি জল গরম করে' রেখে এসেছি ; বাড়ীতেই ছ্যান করবে। আমার কথা শুনে নিস্তারিণী মাসী বলে, শহুরে বড়লোকের মেয়ে পাড়াগাঁয়ে এসে নানান্ অনিয়ম হচ্ছে—এতে অসুখ-বিসুখ হওয়া আর আশ্চর্য্য কি !—এই ত কথা। উল্‌কি (অলকা) নাপতিনী তখন নাইতে গিয়ে ঘড়া মাজ্‌ছিল, সে সেই কথা শুনে, আজ বৌকে আল্‌তা পরাতে এসে বুঝি দশখান করে লাগিয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সেই হারামজাদীই যত নষ্টের গোড়া। এক জনের কথা মিথ্যে করে আর এক জনকে না লাগালে তার ভাত হজম হয় না।"

মন্দাকিনী বলিল, "সেই ছোট লোকের কথা শুনে এত 'গরগরাণি'। কথায় কথায় এত শাসানি গজ্‌রানীই বা কেন ? ভবো এসে যেন আমাদের গলায় হাত দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। চুরীও করি নি, ডাকাতিও করি নি, দিবেরাত্তির দাসীর মত খেটেও ওঁর মন পাবার যো নেই ; লোকে বল্লে—কাকে কান নিয়ে গিয়েছে, নিজের কানে হাত না দিয়ে অমনি কাকের পিছনে ছুটলেন ! হাঁ, দোষ করে থাকি ঝাঁটা মারো ; দোষ নেই, ঘাট নেই, শুধু-শুধু এ কি বালাই ?"

মন্দাকিনীর বীরদর্পে বিলাসিনী কিছু দমিয়া গেল, কিন্তু গোঁ ছাড়িল না ; বলিল, "আমি তোমাদের বড় আপদ-বালাই হয়েছি, তা আমার জন্যে আর তোমাদের ভাত রেঁধেও কাজ নেই, খোঁটা দিয়েও কাজ নেই ; কাল থেকে আমি

নিজের ভাত নিজে রেঁধে খেতে পারি খাব, না পারি শুকিয়ে মরবো।"

প্রবল ঝটিকায় মুক্তদ্বার যেমন সশব্দে বন্ধ হইয়া যায়, বিলাসিনী সেইরূপ শব্দ করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার বন্ধ করিল। সে রাত্রে সে নিজে খাইল না, উঠিয়া ছেলেটাকেও দুধ খাওয়াইল না।—শিশু কাঁদিয়া বলিল, "তাকুমা, আমাকে নিয়ে দা, আমি দুদ কাবো, আমার খিদে নে'গেতে!"

মায়ের কর্ণে তাহার সে কাতর আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল না ; শিশুর ক্রন্দনে ঠাকুরমা বড ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য পুত্রবধূর বিস্তর স্তবস্তুতি করিলেন ; কিন্তু তাহার দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিল না, রাগও পড়িল না। বিলাসিনীর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা!

শিশু মায়ের মুখের কাছে মুখ আনিয়া উভয় হস্তে তাহার মাথা ধরিয়া বলিল, "মা, ওত, তাকুমা দাক্‌তে, দুয়োল্ কুলে দে, আমি দুদ কাবো।"

পুত্রের কথায় উত্তরে বিলাসিনী তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে নিজের পাশে শয়ন করাইল।

শিশুর মুখব্যাদন পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।—বিদীর্ণহৃদয়া বৃদ্ধা চক্ষুর জলে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন ; এবং হরিনামের ঝুলিটি লইয়া হতাশভাবে দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন, অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিলেন, "হে মধুসূদন, হে হরি, আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও ; এ সব যাতনা আর আমার সহ্য হয় না।"

[৫]

বাপের একমাত্র আদরিণী কন্যা বিলাসিনী বাল্যকাল হইতেই একগুঁয়ে। সে যাহা ধরিত, তাহা ছাড়িত না ; অবস্থা-পরিবর্ত্তনে যৌবনেও তাহার সে স্বভাব বদ্‌লাইল না।

ভবসিন্ধুকে সকল কথা লিখিয়া—অবশ্য সেই সঙ্গে দশটা মিথ্যা কথাও লিখিয়া—বিলাসিনী শাশুড়ী ননদের সহিত 'পৃথক্' হইল ; অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পৃথক করিয়া দিল ; নিজে স্বতন্ত্র এক হাঁড়ি কাড়িল। হাবার মার সাহায্যে তাহার কোনও অসুবিধা রহিল না। ভবসিন্ধুর বড় দয়ার শরীর, সে মা ও ভগিনীকে কি করিয়া অনাহারে রাখে?—সে তাঁহাদের উভয়ের জন্য নগদ পাঁচ টাকা মাসহারার বরাদ্দ করিয়া দিয়া মাতৃ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিল। বিলাসিনীর নিকট মণিঅর্ডারযোগে মাসে কুড়ি টাকা আসিতে লাগিল।—এত দিন পরে 'স্বাধীন' হইয়া বিলাসিনী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মাসিক পাঁচ টাকা মাত্র সাহায্য—এই অন্নকষ্টের দিনে দুই জনের ভরণপোষণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহাতে "নুন আন্‌তে পান্তো ফুরোয়, পান্তো আনতে নুন !"—কিন্তু সে জন্য গৃহিণীর মুখে এক দিনও কোনও রূপ আক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই ; বরং কেহ তাঁহার সম্মুখে ভবসিন্ধুর ব্যবহারের নিন্দা করিলে তিনি বলিতেন, "ভব আমার মাসে পঁচিশটি টাকা উপায় করে, কোথা থেকে বেশী পাবে ?"

পাঁচ টাকায় কুলোয় না, হাতে যে দু' পাঁচ টাকা ছিল, তাহাতে একাহারী বিধবাদ্বয়ের কোন মতে দিনপাত হইতে লাগিল ; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পুত্র যে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দিল—এই কষ্টে মাতা সর্ব্বদা ম্রিয়মান থাকিতেন ;

তাঁহার প্রধান কষ্ট গুণিকে তাহার মা তাঁহার নিকট যাইতে দিত না ; পাছে ছেলে পিতামহীর বশীভূত হইয়া তাহার হাত-ছাড়া হইয়া যায়, পাছে নিজের ছেলে পর হয় !

কিন্তু গুণি মায়ের এই সতর্কতা সম্পূর্ণ বাহুল্য মনে করিত ; মায়ের ভয়ে সে সর্ব্বদা ঠাকুমার কাছে যাইতে সাহস করিত না বটে, কিন্তু এই বয়সেই সে মায়ের চক্ষুতে ধূলা দিতে শিখিয়াছিল, বোধ হয় ইহা স্বাভাবিক । আহারান্তে মধ্যাহ্নকালে বিলাসিনী যখন মুক্তকেশরাশি প্রসারিত করিয়া ঘরের মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইত, তখন গুণি অতি ধীরে ধীরে ঠাকুমার রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া কৌতূহল-প্রদীপ্ত-নয়নে ভিতরেব দিকে চাহিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিত, "তাকুমা,—তু-উ-উক ।"

বৃকভানুনন্দিনী প্রেম-বিহ্বলা রাধারাণীর মন যেমন শয়নে-স্বপনে শ্যামের বংশীরবের দিকেই পড়িয়া থাকিত, সেইরূপ শিশু নাতিটির ঐ সুমিষ্ট স্বরটুকুর জন্য বৃদ্ধা ঠাকুমা সর্ব্বদাই উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, কিন্তু বধূর অসন্তোষভয়ে তিনি তাহাকে ডাকিতে পারিতেন না । তাহাকে দিনান্তে একবার কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বনেব জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত ; তাঁহার সে আশা সর্ব্বদা পূর্ণ হইত না ।

"তাকুমা, তু-উ-উক্" শুনিয়াই তিনি হাতের কাজ ফেলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেন, এবং তাহাকে শীর্ণ বাহুপাশে বাঁধিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন না । তিনি মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য বৃদ্ধাগণের নিকট বিবিধ খাদ্যদ্রব্য উপহার পাইতেন ; কেহ কোন দিন দুই চারিটা 'আনন্দের লাড়ু' দিয়া যাইত, কেহ কলাপাতায় জড়াইয়া একটু 'কাসুন্দী' দিয়া যাইত ; নাতির জন্য তিনি তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখিতেন । গ্রাম্য বিগ্রহ রাধাগোবিন্দ দেবের সেবা উপলক্ষে মজুমদার-গৃহিণী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেবতার প্রসাদ পাঠাইতেন, তাহা

নাতিকে খাওয়াইতে না পারিলে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন না। সন্ধ্যাকালে তিনি ঠাকুর দর্শনে গিয়া রাধাগোবিন্দের চরণে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া বলিতেন, ঠাকুর, আমার মাথায় যত চুল, গুণিকে তত বৎসর পরমায়ু দাও।"

বৈশাখ মাসের শেষ দিন গ্রাম্য জমীদার হরিহর বাবুর বাড়ী হইতে যে 'বৈকালী' আসিয়াছিল ; তাহাতে একটি উৎকৃষ্ট আম্র ছিল। বৃদ্ধা নাতির জন্য তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নকালে গুণি লুকাইয়া ঠাকুমার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে সেই আমটি খাইতে দিলেন। বলিলেন, "আমটা এখানে খেয়ে মুখ ধুয়ে তোমার মার কাছে যেয়ো বুঝেছ দাদা ?"

গুণি দাওয়ায় বসিয়া দুই হাতে আমটা ধরিয়া চুষিতে লাগিল। প্রথম জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন, চতুর্দ্দিক্ রৌদ্রে ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল, অদূরবর্ত্তী ঘনপল্লবিত নিম্ববৃক্ষ হইতে নিম্ব-মঞ্জরীর মৃদু সৌরভ উদ্দাম মধ্যাহ্নবায়ু-প্রবাহে এক একবার ভাসিয়া আসিতেছিল, এবং একটা শিশু-গাছের নিভৃত পত্রান্তরাল হইতে একটা ঘুঘু কাতর-কণ্ঠে 'ঘুঘু—ঘু, ঘুঘু—ঘু' করিয়া ডাকিতেছিল ; বোধ হইতেছিল, যেন তাহা নিদাঘ-রৌদ্র-সন্তপ্তা ব্যথিত পল্লী-প্রকৃতির তৃষিত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার !

গুণি দাওয়ায় বসিয়া একাগ্রচিত্তে সেই পাকা আমটি চুষিতেছিল, রস-ধারায় উভয় হস্ত ও বক্ষস্থল প্লাবিত, সে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত বলিল, "তাকুমা, কুব বালো আম ; আমি আল্ একতা নোব।"

ঠাকুমা বলিলেন, "আর ত নেই দাদা, কাল আনিয়ে দেব।"

ইতিমধ্যে বিলাসিনী নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখিল, ছেলে ঘরে নাই ! কি সর্ব্বনাশ !—ডাইনি বুড়ি ছেলেটাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া আদর করিয়া আম খাইতে দিয়াছে।—রাগে বিলাসিনীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ছেলের কাছে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল। তাহার পর তাহার হাত হইতে আমটা কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, গর্জ্জন করিয়া বলিল, "হাবাতে ছেলে ! আমের রসে একেবারে গা ভাসিয়ে ফেলেছে : সমস্ত রাত খক্-খক্ করে কেশে মরবে, আর নুকিয়ে-নুকিয়ে টোকো আম গিলবে ভালবেসে রোগা ছেলের হাতে টোকো আম দেওয়া হয়েছে। অমন ভালবাসার মুখে আগুন !"

গুণি কাঁদিয়া বলিল, "তাকুমা, মা আমাল্ আম কেলে নিয়েতে : আমি আম কাবো।"—পুত্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া বিলাসিনী তাহাকে টানিয়া ঘরে পুরিয়া দরজায় খিল দিল।

বর্ষার সজল-কৃষ্ণ মেঘে আষাঢ়ের আকাশ সমাচ্ছন্ন , নববর্ষার ধারাপাতে পরিপূর্ণ ডোবা ও গর্ত্তগুলিতে ভেকের দল আনন্দ-সঙ্গীত গাহিয়া পর্জ্জন্যদেবের অভিনন্দন করিতেছে। দিবাকর মেঘান্তরালে অদৃশ্য। সমস্ত দিন ধরিয়া টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই পল্লীপথ জনশূন্য। রাত্রে দুর্যোগের আশঙ্কায় গ্রামবাসিগণ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাহিরের কাজ শেষ করিয়া রুদ্ধগৃহে আশ্রয় লইয়াছে।

ভবসিন্ধুর মা ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের স্তিমিত আলোকে তাঁহার শয়নকক্ষস্থ একটি মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। সপ্তাহকাল হইতে তিনি জ্বরে ভুগিতেছেন। জ্বর ইতিমধ্যেই বিকারে পরিণত হইয়াছে। অভাগিনী মন্দাকিনী জননীর শিয়র-প্রান্তে বসিয়া পাখা করিতেছে। বৃদ্ধার বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় ;—চক্ষু দু'টি নিমীলিত, অস্থিচর্ম্মসার বিবর্ণ মুখে রোগের যন্ত্রণা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

ভবসিন্ধু গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। মায়ের জ্বর হইয়াছে শুনিয়াও সে প্রথমে সে কথায় কর্ণপাত করে নাই , বৃদ্ধাও জ্বরকে প্রথম গ্রাহ্য করেন নাই। জ্বরের উপরেই তিনি স্নানাহার করিয়াছেন, বর্ষার জলে ভিজিয়াছেন। জীবনের প্রতি যাহার মমতা নাই, স্বাস্থ্যরক্ষায় তাহার দৃষ্টি থাকে না , কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জ্বরের উপর এত অনিয়ম সহ্য হয় না। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহাকে শয্যা লইতে হইল , জ্বর ক্রমে বিকারে পরিণত হইল।

ভবসিন্ধু ডাক্তার ডাকিতে চাহিল। মা বলিলেন, প্রাণ গেলেও তিনি ডাক্তারের ঔষধ খাইবেন না।—তখন ভবসিন্ধু অগত্যা গ্রাম্য কবিরাজ তারাচাঁদ গুপ্তকে ডাকিল ; কিন্তু তারাচাঁদের বটিকায় কোনও ফল হইল না , রোগের উপশম না হইয়া দিন দিন বিকারের প্রকোপ বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে কবিরাজ নাড়ী টিপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বয়স হইয়াছে চিকিৎসাটাও বড় বিলম্বে আরম্ভ হইয়াছে ; ঔষধে যে আর কোনও সুফল হইবে, তাহা বোধ হইতেছে না।—আমার মতে সজ্ঞানে 'গঙ্গাতীরে' লইয়া যাওয়াই ব্যবস্থা।"

বৃদ্ধা সমস্ত দিন বিকার-ঘোরে প্রলাপ বকিয়াছেন , সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল ; রাত্রি নয়টার সময় নিদ্রাভঙ্গে সহসা যেন তাঁহার বিকারের মোহ কাটিয়া গেল, তিনি স্বাভাবিক স্বরে ডাকিলেন, "ভব !"

ভবসিন্ধু খলে ঔষধ মাড়িতেছিল ; মায়ের আহ্বানে সে তাঁহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এখন কেমন আছ, মা ?"

মা মৃদুস্বরে বলিলেন, "আর বাবা, আজ রাত্রিটা কাটবে ব'লে বোধ হচ্ছে না ,

দেখো যেন আমার হাড়খানা গঙ্গায় পড়ে। আমি বাবা বড়ই অভাগী, এক দিনের জন্যেও তোমাদের সুখী কর্‌তে পারি নি। আহা, আমার গুণিকে ছেড়ে যেতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে, দাদা আমার কাছে থাক্‌তে কত ভালবাসে! এক দিনও তাকে নিয়ে সাধ-আহ্লাদ কর্‌তে পারলাম না; এ দুঃখ রাখ্‌বার জায়গা নেই। তোমরা বাপ-বেটায় এক শ' বছর বেঁচে থাক, কর্ত্তাদের ভিটেয় যেন প্রদীপটা জ্বলে।"

ভবসিন্ধুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, আমি তোমার অধম সন্তান, আমার অপরাধের মার্জ্জনা নেই; তোমার কুপুত্র তোমার সেবা-শুশ্রূষা কিছুই করতে পার্‌লে না।"—ভবসিন্ধু দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া শিশুর ন্যায় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মা বলিলেন, "কেঁদো না বাবা! তোমার কোনও দোষ নেই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এত কষ্টেও যদি বৌমা এক দিন আমাকে মা ব'লে ডাক্‌তেন, হাসিমুখে যদি দুটো কথা বলতেন, তা হ'লে আমি কোনও কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করতাম না। একবার গুণিকে আমার কাছে আন, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই। আমার আর বেশী সময় নেই।"

ভবসিন্ধু মাতাকে ঔষধ খাওয়াইয়া পুত্রকে তাঁহার নিকটে আনিবার জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, দেখিল, বিলাসিনী মাদুরে বসিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িতেছে; গুণি মায়ের পাশে বসিয়া একটা কাঠের ঘোড়া লইয়া খেলা করিতেছে; এত রাত্রেও আজ সে ঘুমায় নাই।

ভবসিন্ধু বলিল, "মা বুঝি এ যাত্রা আর রক্ষা পান না, তুমি একবার তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে এসো; এত দিন যা করেছ, করেছ, এখন তাঁর অন্তিমকাল, আর মনের কোনও গোল রেখ না।"

বিলাসিনী পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "সকল তাতেই তুমি আমার দোষ দেখ, এমন অদেষ্ট নিয়েও সংসারে এসেছিলাম! আমার অদেষ্ট যদি ভালই হবে, তা হ'লে বাবা কেন অসময়ে মারা যাবেন?"---বিলাসিনীর পিতৃশোক সহসা প্রবল হইয়া উঠিল, তাহার চোখের পাতা আর্দ্র হইল।

ভবসিন্ধু একবার আরক্ত-নেত্রে পত্নীর দিকে চাহিল; কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া সে পুত্রকে কোলে লইয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

গুণি তাহার ঠাকুরমার কোলের কাছে বসিল, তাহার ক্ষুদ্র হাতখানি দিয়া ঠাকুরমার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "ঠাকুমা! তোর ব্যামো হয়েতে? তুই আম কাবি? আমি তোকে পাকা আম দেব।"

ঠাকুরমা সস্নেহে বলিলেন, "না দাদা, আমি আম খাব না, তুমি খেয়ো, আমার বড় অসুখ। আজ আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি দাদা!"

গুণি তাহার ঠাকুরমার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই কুতা দাবি তাকুমা ? গন্‌না নাইতে দাবি ?" আমি তোল তন্‌নে দাবো । আমি তোকে দেতে দোব না তাকুমা, তোল দন্যে আমাল্ মন কেমন কল্‌বে ।"

ঠাকুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে কি আমার ছেড়ে যেতে সাধ ? ভগবান্ আমাকে কোলে টেনে নিচ্ছেন, আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি দাদা !"

গুণি বলিল. "আমি দাবো ।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "যাঠ. ও কথা বলে না ; তুমি এক শ' বছর হয়ে বেঁচে থাকো ।"

"আবাল্ কবে আত্‌বি তাকুমা ?"—ম্লান দীপালোকে বালক মরণাহতা বৃদ্ধা পিতামহীর মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রশ্ন করিল । তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল ।

ঠাকুরমা অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে গদগদস্বরে বলিলেন. "আর আস্‌বো না দাদা, আমার সময় শেষ হয়েছে, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সোনার দোয়াত-কলম হোক !"--তাহার পর তিনি পুত্রেব দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা ভব ; মন্দা থাক্‌লো, সে জনম-দুঃখিনী, যত দিন বাঁচে, দু-মুঠো ভাতে তাকে বঞ্চিত করো না !"

ভবসিন্ধু বলিল, "মা, তোমাকে আর এ কথা বল্‌তে হবে না ; আমি না বুঝে তোমাদের উপর বড় অন্যায় করেছি । এত দিনে আমার ভুল ভেঙ্গেছে, আমি তোমার কুলাঙ্গার সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর ।"

মা বলিলেন, "ও কথা বলো না বাছা, তুমিই তোমার বাপ বড় বাপের জলপিণ্ডের ভরসা ; তোমার মত ছেলে কয়জন পায় ? আমার আর কোনও কষ্ট নেই । হে হরি, হে মধুসূদন, আমার বাছাদের মঙ্গল ক'রো, আমার অপরাধে এরা যেন কষ্ট না পায় । মন্দা, মা, তুই ভবোর কি বৌ-মার অবাধ্য হস্ নে, তাদের মনে কষ্ট দিস নে ; এ সংসারে তোর আর কে আছে মা ? বাবা ভব, আমার বুকের মধ্যে কেমন ফাট্-ফাট করচে, চোখে আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে , বৌ-মাকে একবার ডাকলে না ?"

ভবসিন্ধু ব্যস্তভাবে বিলাসিনীকে ডাকিতে চলিল ; শয়নকক্ষে গিয়া দেখিল, পুস্তকখানি বুকের উপর রাখিয়া সে নিদ্রা যাইতেছে ! সে পত্নীর নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতেছে—এমন সময় মন্দাকিনী ঝড়ের ন্যায় বেগে ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভব, শীগ্‌গির এসো ; মা কেমন কর্‌চেন !"

ভবসিন্ধু আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে না দাঁড়াইয়া মায়েব নিকট চলিল ; দেখিল. হিক্কা আরম্ভ হইয়াছে , তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু বিস্ফারিত, সে চক্ষুতে অস্বাভাবিক

দীপ্তি, অতি কষ্টে নিশ্বাস বহিতেছে, ঘর্ম্মধারায় সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত, শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা !

ভবসিন্ধু উদ্বেলিতস্বরে ডাকিল, "মা !"

মা অতি কষ্টে বিকৃত স্বরে বলিলেন, "হরি হে, দীনবন্ধু ! অন্তিমে চরণে স্থান দাও।"

গুণি ঠাকুরমার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইল। তাঁহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া দুই হাতে তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "তাকুমা, তোল কি হযেছে ? তাকুমা, আমাকে তোলে নে, আমার ভয় নাগ্‌ছে।"

মন্দাকিনী সরোদনে জননীর কর্ণমূলে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা দুই চারিবার অস্ফুটস্বরে "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" বলিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষুর উপর মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

কড়-কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল ; সন্-সন্ করিয়া বেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল, ঝম্-ঝম্ শব্দে মুষলধারায় বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল।—যেন প্রলয়কাল সমুপস্থিত ! মন্দাকিনী মাতার পদতলে নিপতিত হইয়া আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল—"মা গো মা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও ; তোমার দুঃখিনী মেয়েকে ফেলে যেও না মা ! তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌বো ? আমার যে আর কেউ নেই মা !"

ভবসিন্ধু কোনও মতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। মায়ের প্রতি সে এতদিন যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া দুঃখে, কষ্টে, অনুতাপে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

এমন সময় বিলাসিনী সেই কক্ষে আসিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "দেখ দেখি আক্কেলখানা ! ছেলেটাকে কোথায় ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ?"

বিলাসিনী তাহার শিশু পুত্রকে ডাকিল, কিন্তু সে নড়িল না। সে তাহার ঠাকুরমার মুখে হাত দিয়া বলিল, "তাকুমা, তুই ঘুমিযেছিত্ ? ওট্, আমাতে তোলে নে !"

বিলাসিনীর আর সহ্য হইল না ; সে পুত্রের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল। তখন শিশু উভয় হস্তে তাহার পিতামহীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তাকুমা, আদ আমি তোল তাতে শুয়ে থারবো, আমি মাল তাতে দাবো না ; আমাতে তোলে নে !"

বিলাসিনী পুত্রকে টানিয়া সেই কক্ষের বাহিরে লইয়া গেল। শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "তাকুমা আমতে তোলে নে, আমি তোল্ পাতা তুল্ তুলে দেব। তাকুমা, আমাতে তোলে নে !"

ঠাকুরমা তখন সংসারের সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন ; তাঁহার চির-বধির কর্ণে শিশুর সেই কাতর ক্রন্দন প্রবেশ করিল না । বাহিরে উদ্দাম ঝটিকা সোঁ-সোঁ শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিল . সৌদামিনী-স্ফূরণে চতুর্দ্দিক মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হইয়া চরাচর গভীরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল , কড়-কড় বজ্রনাদে প্রকৃতি-দেবীর হৃদয়ভেদী সুতীব্র হাহাকার পরিব্যক্ত হইল , এবং বর্ষার দিগন্তব্যাপী মেঘ শোকাচ্ছন্ন প্রকৃতি-দেবীর অশ্রুবর্ষণের মত অশ্রান্ত বারিবর্ষণে অন্ধকারাবগুণ্ঠিত মৌন ধরাতল প্লাবিত করিতে লাগিল ।

সপ্তম স্তবক

নববধূ

[১]

কাত্যায়নী পিতামাতার একমাত্র কন্যা,—অত্যন্ত আদরিণী। কিন্তু সে আট বৎসরে পড়িতে-না-পড়িতে বিশ্বজননী তাহার পিতা রামগোবিন্দকে কোলে টানিয়া লইলেন।

ক্ষুদ্র পুরন্দরপুর গ্রামখানি নদীবর্জ্জিত স্থান ; গ্রামের নিকটেও কোন বিল খাল ছিল না। গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণীর আকারবিশিষ্ট একটা নরককুণ্ড ছিল, পীতবর্ণ তাহার জল ; গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে গ্রাম্য মহিষগুলা সেই জলে সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া বসিয়া থাকিত, এবং মহা সমারোহে কাদা মাখিত ! প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ক্ষারসিক্ত ময়লা কাপড় কাচিবার শব্দে তাহার চারি 'পাড়' প্রতিধ্বনিত হইত ; এবং সেই জলে গ্রামবাসীদের সকল প্রয়োজন নির্ব্বিচারে সম্পন্ন হইত। গ্রামের শুচি-বাতিক-গ্রস্তা রমণীগণের লেপ-কাঁথা সেই জলে না কাচিলে পবিত্র হইত না।—একবার বসন্তের প্রারম্ভে এই গ্রামে বিসূচিকা দেখা দিল ; গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল নাই, লোকনাথ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী-বিতাড়িত কম্পাউণ্ডার বিপিন দত্ত ভিন্ন ডাক্তারও নাই ! সুতরাং কয়েক দিনের মধ্যেই রোগ সংক্রামক হইয়া উঠিল, এবং বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতে এই অবস্থায় যাহা ঘটে, পুরন্দরপুরেও তাহাই ঘটিল ? গ্রামবাসীরা বিনা শুশ্রূষায়—অচিকিৎসায় দলে-দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রামগোবিন্দও এই রোগে মারা গেল। নারায়ণীর হাতের নোয়া ঘুচিল সিঁথির সিন্দূর মুছিল ; কিন্তু পৃথিবীর কাজকর্ম যে ভাবে চলিতেছিল; সেই ভাবেই চলিতে লাগিল !

মেয়ে লইয়া নারায়ণী বড় বিপদে পড়িল। আজকাল ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে বরপণ প্রথা যেরূপ উগ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে নিম্নতর সমাজেও তাহার বিলক্ষণ প্রভাব অনুভূত হইতেছে। সু-পুত্রবতীরা সকলেই বলেন, "আমার পাশ-করা ছেলে, গা-ভরা গহনা ছাড়া বৌ ঘরে তুল্‌বো ?"—একথা শুনিয়া নারায়ণী বড় ভয় পাইল ! পুরোহিত বরদা ঠাকুর একদিন তাহাদের গৃহে পদধূলি দান করিয়া বলিলেন, "অষ্টমে গৌরীদানই প্রশস্ত, কিন্তু কালাশৌচের প্রতিবন্ধক আছে ; ন' বছরে কাতির বিবাহ না দিলেই নয় !"—সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর একটা শাস্ত্রীয় শ্লোক আওড়াইয়া তাঁহার উক্তির সমর্থন করিলেন।

কাত্যায়নীর এক কাকা ছিল, নাম রামযাদু !—সে মুড়ী-মুড়কীর দোকান

করিত ; যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাইত। লোকটা পল্লীবাসী, মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত। দাদার স্ত্রী ও দাদার মেয়ে তাহার চোখের উপর অনাহারে শুকাইয়া মরিবে—আর সে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া হরি স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত পরকালের কাজ করিবে, অর্থাৎ রামায়ণ শুনিবে, ইহা সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে করিল। সুতরাং রামযাদু পরামাণিক ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিল। রামযাদুর শ্যালক নিধিরাম এ সংবাদ শুনিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল, "আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে ! এবার রামযাদুর ভিটেয় ঘুঘু চরবে।"

কিন্তু শ্যালকের এই মন্তব্য শুনিয়াও রামযাদু ঘুঘুর ভয় করিল না। কিঞ্চিৎ অধিক বিক্রয়ের আশায় সে সন্ধ্যার পরও দোকানে বসিতে লাগিল। তাহার প্রতিবেশী তারণ ঘরামী একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার দোকানে আসিয়া বলিল, "কি গো পরামাণিকের পো, আমায়ণ শুনতে যাও নি ?"—রামযাদু 'ব্যাজার' হইয়া বলিল, "দুত্তোর রামায়ণ ? আমার ভাজ ভাইঝি যদি না খেয়েই মরে, তবে পুণ্যির ছালা পিঠে বেঁধে আমার লাভটা কি হবে ?"

সুতরাং রামযাদুর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রশংসা করা যায় না। বিশেষত, তাহার আর একটা মহদ্দোষ ছিল ; সে কাত্যায়নীর বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। নারায়ণী ব্যস্ত হইয়া একদিন বলিল, "ঠাকুর পো, কাতির যে বিয়ের বয়স পার হ'য়ে গেল !" রামযাদু লোহিত দন্তরুচি বিকাশ করিয়া বলিল, "তোমার হান্‌ফানানি দেখে আমার গায়ে জ্বর আসে ! ঐ টুকু মেয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে থাক্‌তে পারবে ? মেয়ে মানুষগুলো যেন কি ? মেয়ের বিয়ে দিবার জন্যে যেমন অস্থির ; আবার বিয়ে দিয়ে মেয়ে বিদেয় করবার সময় তেম্‌নি কেঁদেই সারা হয় !—দুত্তোর মেয়েমানষের দয়ামায়া !"

কাত্যায়নীর মুখখানি বড় সুন্দর, সে যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা।—বড় ধীর শান্ত, মেয়ে। পিতার মৃত্যুর পর বিষাদের কালো ছায়া তাহার মুখের উপর স্থায়ীভাবে বসিয়া গিয়াছে। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না। এক একদিন সন্ধ্যাকালে সে ঘরের দুয়ারে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিত, আর তাহার চোখের জল গাল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া আঁচলে পড়িত। তাহার পর তাহার মা তাহাকে ডাকিলে, সে নিশব্দে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া মায়ের রন্ধনকার্য্যে সহায়তা করিত।

কাত্যায়নী মায়ের সঙ্গে দু'বেলাই হেঁসেলে যাইত। কুটনো-কোটা-বাটনা-বাটা রন্ধনের জল তুলিয়া আনা, প্রভৃতি কার্য্যের ভার তাহার উপরেই ন্যস্ত ছিল।

রাঁধিবার কৌশলটাও সে মায়ের নিকট এক একদিন শিখিয়া লইত। মা বলিত, "তুই ছেলেমানুষ! রাঁধ্‌তে গিয়ে শেষে হাত পা পুড়িয়ে ফেল্‌বি?"

রামযাদু এ কথা শুনিয়া একদিন বলিল, "হ্যাঁ, রাঁধতে শিখবে বৈ কি? দেখিস কাতি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে রান্নার যশ নেওয়া চাই। কেউ না বলে, কেমনতর মা! মেয়েকে রাঁধতে শিখায় নি?"

কাত্যায়নীর কাকী 'সৈরবী' রান্নাঘরে স্বামীর আহারের স্থান করিতে আসিয়া নারায়ণীকে বলিল, "তোমার মেয়ে রাঁধ্‌তে যাবে কোন্‌ দুঃখে দিদি? এমন ঘরে ওর বিয়ে হবে যে, পাঁচটা রাঁধুনি ওর সংসারের ভাত রাঁধবে, চাক্‌রাণীতে আঁচিয়ে দেবে। আমাদের আচায্যি ঠাকুর ত গুণে বলেছে, আমাদের কাতি জমিদারের ঘরে পড়বে।"

কাত্যায়নীর মা দেবরের জন্য ভাত বাড়িতে-বাড়িতে বলিল, "তেমন কপাল আমাদের নয়, বোন! জমিদার চাই নে, ও যেন পাঁচজনকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে পারে, আর ওকে অতিথ-ফকিরদের যেন খালি হাতে দুয়োর থেকে ফিরোতে না হয়। গেরস্তের মেয়ের আর এর চাইতে কি বেশী সুখ বল দেখি? হাতের নোয়া বজায় দেখে, পাকা চুলে সিঁদুর পরে যে ডঙ্কা মেরে চলে যেতে পারে,—তার বাড়া 'ভাগ্যিমানী' কে আছে?"

কিন্তু তখন কাত্যায়নীর বিবাহের কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না। পুরন্দরপুরের হরিতারণ বিশ্বাসের পুত্র রামতারণ কলিকাতায় মেসে থাকিয়া রিপণ কলেজে বি-এ পড়িত। প্রকাণ্ড তেতালা মেসের কুঠরীতে সাতসিকা মূল্যের 'জাকল' কাঠের তক্তপোষে শয়ন করিয়া তাহার মেজাজ কিছু গরম হইয়া উঠিয়াছিল। একবার সে গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে আসিয়া শুনিয়াছিল, কাত্যায়নীর জন্য একটি পাত্রের আবশ্যক। মেসে অনেক ছেলে থাকে শুনিয়া নারায়ণী তাহাকে ধরিয়া বসিল। ঘটকালী করিতে হইবে শুনিয়া রামতারণ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; এবং চোখ হইতে চশমা খুলিয়া রুমাল দিয়া খানিকক্ষণ মনোযোগের সহিত তাহা মুছিয়া—চশমা জোড়াটা নাকের ডগায় আঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাত্যায়নী কতদূর ইংরাজী পড়েছে? 'লেস্‌' বুনতে শিখেছে ত? 'হারমোনিয়ম' বাজাতে পারে কি না?"—প্রশ্ন শুনিয়াই নারায়ণীর চক্ষু স্থির! এ সকল ভিন্ন কি মেয়ের বিয়ে হয় না? উচ্চ শিক্ষাভিলাষী রামতারণ ভুলিয়া গিয়াছিল এইরূপ অশিক্ষিতা মায়ের গর্ভেই তাহার জন্ম! কলিকাতার কলের জল খাইয়া ও বেথুন কলেজের গাড়ীতে মেয়েদের স্কুল কলেজে যাইতে দেখিয়া রামতারণের ধারণা হইয়াছিল, "দেখ লো সজনি, চাঁদিনী রজনী,—সে যদি শুধু আসিত!" হারমোনিয়ম-যোগে এই সকল গান যে মেয়ে গাইতে না শিখিয়াছে,

তাহার জীবনই বৃথা ! সুতরাং সে চশমার ভিতর হইতে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া জবাব দিল, "নাঃ, ও চল্‌বে না ! আমাদের কলেজের ছেলেদের মধ্যে এমন অচল মেয়ে কেউ গছবে না। পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের কি আর ভাল বিয়ে হয় ? তাতে আবার দিতে-থুতে পারবে না।—কি লোভে বর জুট্‌বে ?"

এই সকল উচ্চ অঙ্গের কথা শুনিয়া কাত্যায়নীর মা বড়ই কাতরা হইল, তাহার মন আরও দমিয়া গেল। ছেলে পাওয়া যায় না ; যদি বা পাওয়া যায়, রসরাজ অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাটে'র নন্দলালের বাপের মত সোনার ল্যাজ-শুদ্ধ চাহিয়া বসে ! এরূপ লাঙ্গুল-লুব্ধ বৈবাহিকের দিকে ঘেঁষিতেও তাহার সাহস হইল না। কেবল টাকার অভাবে এমন রূপবতী গুণবতী মেয়ে সমাজের হাটে বিকায় না, এ দুঃখ রাখিবার সে ঠাঁই পাইল না।

[২]

গোপালপুরের নেপাল পালের পুত্র বৃন্দাবন পাল কৃতী যুবক। গোপালপুরে তাহার 'পসরহাট্টার' দোকান আছে। ঝুমঝুমি চুষিকাঠি হইতে শ্রাদ্ধের উপকরণ পর্য্যন্ত বিশ্বসংসারের এমন দ্রব্য অল্পই আছে যাহা তাহার দোকানে না মিলিত।

বৃন্দাবনের ভাই মথুরা দোকানে খরিদ-বিক্রয়ের অধিকাংশ কার্য্যই করিত। মথুরানাথের বয়স বাইশ বৎসর, অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়ায় সে পিতার কিছু অতিরিক্ত আদর লাভ করিয়াছিল; কিন্তু বৃন্দাবনের সতর্কতায় সে 'বহিয়া যাইতে' পারে নাই। চৌদ্দ বৎসরের পর হইতেই বৃন্দাবন তাহাকে কড়া পাহারায় রাখিয়াছিল ; সে তাহাকে প্রায়ই দোকানের বাহিরে যাইতে দিত না।

কিন্তু তথাপি মথুরো মধ্যে-মধ্যে বাঁধন ছিঁড়িত। পদ্মার তীরে এই গোপালপুর গ্রামখানি অবস্থিত।—গ্রীষ্মকালে ক্ষীণকায়া পদ্মা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। অপরাহ্নের লোহিত রবিকর-সম্পাতে পদ্মাবক্ষ ঝলমল্ করিতেছে ; হাজার-মণে মহাজনী নৌকা খরস্রোতে পালের জোরে লক্ষ্য পথে ছুটিতেছে ; ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া জেলেরা দূরে দূরে ইলিশ মাছ ধরিতেছে। পল্লীযুবতীরা কাঁকে কলসী লইয়া প্রান্তর-পথে সারি বাঁধিয়া পদ্মার জল আনিতে যাইতেছে ; আর নদীতীরস্থ আকন্দ বনে বসিয়া একটা ঘুঘু মাথা নাড়িয়া ক্রমাগত ডাকিতেছে, 'ঘুঘু—ঘু', ঘুঘু—ঘু'। এই সকল দেখিবার জন্য এক একদিন মথুরা ছুটিয়া বাহির হইত, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া নদীর অপর পারস্থিত দিক্‌চক্রবাল-সীমায় বনানীশ্যামল সুবিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের সৌম্যমূর্ত্তি নির্নিমেষ-নেত্রে নিরীক্ষণ করিত।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারগাঢ় হইয়া আসিত। সে নদীতীরবর্ত্তী প্রান্তরের উপর দিয়া একাকী গ্রামে ফিরিত ; সন্ধ্যার বাতাস হু-হু করিয়া মাঠের উপর দিয়া বহিয়া যাইত ; এক ঝাঁক বক তাহার মাথার উপর দিয়া সন্-সন্ করিয়া উড়িয়া যাইত ; কোনও দিকে অন্য কোন শব্দ নাই। গ্রামের পথ সন্ধ্যার পর জন-সমাগমশূন্য। মথুরার মনে হইত, সংসারে সে বড়ই একা !—পাঁচ বৎসর বয়সের সময় সে মাকে হারাইয়াছে। মায়ের স্নেহ, আদর ও যত্ন এখনও তাহার মনে পড়ে।—কি ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার পর সে দোকানে আসিয়া বসিত। কিন্তু তখন তাহার কোন জিনিস বিক্রয় করিতে ইচ্ছা হইত না—'আনন্দ কুটীরে'র মৃদঙ্গধ্বনি ক্রমাগত তাহার মনকে সেই দিকে আকর্ষণ করিত।

মথুরের এই ভাব দেখিয়া তাহার দাদা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে মোথ্‌রো ! তোর হ'ল কি ? তুই শেষে 'ভেক্' নিবি না কি ?"

মথুরা চটিয়া বলিল, "হাঁ—এ্যাঁ, তোমার যেমন কথা !—ভেক্ আবার মান্‌ষে নেয় ?"—বৃন্দাবন ভাবিল ভায়াকে সংসারী করা দরকার।

বৃন্দাবন তাহার সঙ্কল্পের কথা পিতার গোচর করিল। নেপাল সংসারের বড়-কিছু দেখিত না ; আফিং খাইত, সুতরাং সেরখানেক দুধ, কৌটা-ভরা আফিং, আর তার 'শ্রীভাগবত'খানি ভিন্ন সংসারের অন্য কোনও দ্রব্যে তাহার আস্থা ছিল না। বৃন্দাবন বলিল, "মোথরোর একটা বিয়ে দেওয়া যাক্।" নেপাল বলিল, "তা একটা মেয়ে-টেয়ে দেখ্। আমি তোর বিয়ে-থাওয়া দিয়ে দিয়েছি, তুই 'নায়েক' হয়েছিস্ ; ছোঁড়াটার একটা গতি করে দে। আমি আর কি বল্‌বো ? আমার ত এখন গঙ্গা পানে ঠ্যাং !"

বৃন্দাবনের স্ত্রী কালিদাসী সংসারের কর্ত্রী। কালিদাসী সওয়া-একগণ্ডা ছেলে মেয়ে লইয়া বিব্রত, তাহার উপর সমস্ত সংসারটা তাহার ঘাড়ে। এই বোঝার উপর সম্প্রতি একটি "শাকের আঁটি"ও তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছিল ! তাহার চারি মাসের মেয়েটি একদণ্ড শুইতে চাহিত না ; এবং মায়ের কোল ভিন্ন খুকীর নিদ্রা হইত না। কালিদাসী ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছে, "একটা 'নুড়কুত' নৈলে সংসার চালাতে পারি নে !"

কালিদাসী দেবরের বিবাহের জন্য মেয়ে খুঁজিতেছিল। বৃন্দাবনের অবস্থা পল্লী-গৃহস্থের হিসাবে বেশ সচ্ছল। তাহার ভাই মথুরাও 'খরিদ-বিক্রী'তে ভাল ; এরূপ সুপাত্রের কনে জুটিতে বিলম্ব হয় না। কালিদাসীর কাছে অনেক উমেদারনীর সমাগম হইত ; কিন্তু গ্রামের একটি মেয়েও তাহার মনে ধরে নাই। বৃন্দাবনচন্দ্র তাহার স্ত্রীকে ভ্রাতার বিবাহের কথা বলিলে, কালিদাসী বলিল, "আগে মেয়ে খোঁজ কর। কালো মেয়ের সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে দেওয়া হবে না। কালো

বউ ঘরে আন্‌লে পাঁচ জনে গঞ্জনা দেবে ; বলবে—'মা নেই কি না, ভাজে আবার ভাল মেয়ে আন্‌বে' ?"

বৃন্দাবন বলিল, "ও পাড়ার হারান সা'র মেয়েটি মন্দ নয়। বাপের ঐ একটী মেয়ে ; দু'তোলা দেবে-থোবেও। আর চাই কি, মেয়েকে কিছু দিয়ে যেতেও পারে।"

কালিদাসী বলিল, "দু'তোলা নিয়ে ত আমরা রাজা হয়ে যাব !—ও কাজ কখ্‌খনো করো না। ঠাকুরপো শেষে শ্বশুরের দিকে গ'ড়ে পড়বে, ঘরজামাই হবে ; তোমার আমও যাবে, ছালাও যাবে। হারাণ সা'র মেয়ে আস্‌বে আমার 'নুড়কুতি' করতে ?—কাজ নেই আমার এমন 'নুডকুতে' !"

গ্রামে বা নিকটস্থ কোনও গ্রামে মনের মত মেয়ে পাওয়া গেল না শুনিয়া জ্ঞাতি-সম্পর্কে ঠাকুরদাদা নফর পাল বলিলেন, "শালা, তুমি কি ডানাকাটা পরী চাও ? বৌকে হাটে বিক্রী করতে হবে ? কানা খোঁড়া না হ'লেই হ'লো।—কলিকালে আরও কত দেখ্‌বো ! সাধে কি আর গরুর বাঁটে দুধ নেই ?"

যাহা হউক অবশেষে বৃন্দাবনের শ্যালক অঘোর হালদার সংবাদ দিল, সে তাহার মাসীর বাড়ী গিয়া পুরন্দরপুরে একটি মেয়ে দেখিয়া আসিয়াছে, "মেয়েটি যেন পরী ; কিরে তার নাক মুখের গড়ন ! আর ভুরু দুটী যেন তুলি দিয়ে আঁকা !—দশ বছরের, মেয়ে একটা 'যজ্ঞি' রাঁধতে পারে।"

কালিদাসী মেয়েটিকে না দেখিলেও তৎক্ষণাৎ তাহাকে পছন্দ করিয়া বসিল। একে তাহার দাদার প্রশংসাপত্র, তাহার উপর মেয়ে সুন্দরী এবং 'যজ্ঞি' রাঁধতে পারে !—সে বৃন্দাবনকে এই মেয়েই ঠিক করিতে বলিল।

বৃন্দাবন তাহার কুটুম্ব-শ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল, "কার মেয়ে হে !"

অঘোর বলিল, "আরে আমাদের নুটবিহারীর শালা রামযাদু পরামাণিকের ভাইঝি। মেয়ের বাপ নেই। রামযাদু মুড়ী-মুড়কীর দোকান করে। দেখ, যদি মেয়ে পছন্দ হয় ; কিন্তু কিছু দিতে-থুতে পারবে না।—'আবস্তা' ভাল নয়।"

কালিদাসী বলিল, "মেয়েটি ভাল হ'লেই হলো, আমরা কিছু পাওয়া-থোয়ার 'পিত্যেশ' করি নে। পরের নিয়ে আর কে করে বড় মানুষ হয়েছে ?"

কলিকাতা অঞ্চলের ব্রাহ্মণ কায়স্থদের ঘরের তিন পাশগ্রস্ত ছেলের মা এই

অশিক্ষিতা, বুদ্ধিহীনা, পল্লী-নারীর নির্লোভিতা দেখিয়া তাহাকে ধিক্কার দান করুন, এবং ছেলের বাপেরা হতভাগ্য বৃন্দাবনকে 'পিটি' করিতে থাকুন।

[৩]

কাত্যায়নীর কাকা রামযাদু দেখিল, সম্বন্ধটা মন্দ নয়। নেপাল পালের ঘরে খাবার আছে, এবং তাহার পুত্রের সহিত ভাইঝির বিবাহ দিতে তাহার মুড়ি-মুড়কীর দোকান সহ বাস্তুভিটাটুকু বিক্রয় করিবার আশঙ্কা নাই। বৃন্দাবন পাঁচ ক্রোশ গরুর গাড়ী, আঠারো ক্রোশ ষ্টীমার, এবং তাহার পর আড়াই ক্রোশ পদব্রজে আসিয়া রামযাদুর গৃহে উপস্থিত হইল, এবং কাত্যায়নীকে দেখিবামাত্র তাহার পছন্দ হইল। বৃন্দাবন তাহার সম্বন্ধীকে সঙ্গে আনিয়াছিল; সে পূর্ণমাত্রায় ঘটকালী করিল, বৃন্দাবনকে বলিল, "এমন মেয়ে ভূ-ভারতে পাবে না হে!—মোথ্‌রোর কপাল ভাল। সম্বন্ধটা চট্ করে ঠিক করে ফেল।—রঘুনাথপুরের দুকড়ি বিশ্বাস তার ছেলের বিয়ের জন্য দেশ-বিদেশে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে; 'ভাগ্যিবান' লোক কি না, ক-বছর দুনো দামে পাট বিক্রী করে এক্কিবারে ফেঁপে উঠেছে। সাড়ে দশগণ্ডা মেয়ে দেখে একটাকেও তার পছন্দ হয় নি; কিন্তু কাত্যায়নীকে তার মনে ধরেছে। তবে সে কি না অনেক দূর, গর-জিলা; তাই সেখানে বিয়ে দিতে মেয়ের মায়ের মন সরচে না।"

রামযাদু মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, সেখানে বিয়ে দিলে ত মেয়েটা ঘিয়ে খেত, দুধে আঁচাতো। তা বৌঠাকরুণ ঐ এক রকমের মানুষ; বলে 'সে বাঙ্গাল দেশে মেয়ের বিয়ে দেব না।'—তবে আমার বাপু সোজা কথা, ওরে ও ফোজো, এক কল্‌কে তামাক সেজে আন্, কুটুম্ব এলো বাড়ীতে, বেটা বুঝি ঘুড়ি নাটাই নিয়ে মেতেছে!—যাক কি বল্‌ছিলাম; হাঁ, আমার সোজা কথা! আমার ত বাবু সন্দেশ মুড়কীর দোকান, তার উপর এই দুব্বৎসর, কিছু দিতে থুতে পারবো না; তখন যে বিয়ে দিতে এসে ছান্‌লাতলায় বামন কায়েতদের মত দাঁড়ি পাঁচসেরা, দূর ছাই, কি বলে—নিক্তি ফিক্তি বের করবে, সে হবে না; আমি শুধু মেয়েটি সম্প্রদান করবো।—তোমরা গা-ভরা গহনা দেবে।"

বৃন্দাবন বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমরা কি দেব না দেব, সে কথা বল্‌তে চাইনে, আমাদের বৌ, যে দু'তোলা পারি, দেব।—তবে বামন কায়েতরা আমাদের ছোট জাত বলে; আমরা ত তাদের মত কশাই হতে পারি নি। আমি মশায় দু'ভরি পাবার পিত্যেশায় একাজ করছি নে; মেয়েটি ভাল, শুনেছি গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মও বেশ শিখেছে, এই জন্যই আমার এত 'আগ্র', আপনারা

কিছু দেন না দেন তাতে কিছু যায় আসে না।"

রামযাদু পুলকিত হইয়া বলিল, "হাঁ, এ মানুসের মত কথা বটে, বামন কায়েতরা এ কথা মুখেই আনতে পারতো না ।— ছেলের বিয়ে দিতে এসে তারা কেবলই 'লুষে' নিয়ে যায়। ছেলেব বিয়ে দিতে হ'লে কন্যাকর্ত্তাব বাড়ী গিয়ে দশটাকা খরচ করতে হয়, এও তারা জানে না ! নাপিত পুরুতকে দু'টাকা দিতে হ'লেই মাথায় বজ্রাঘাত ! ওরে ফোজো, তামুক দিলি ? তা মশায়, বিয়ে দিতে আসবেন, এখানে পাঠশালা আছে, বারোয়ারী আছে, মা রক্কেকালী আছেন, পাঁচজন ব্রাহ্মণের এখানে বাস, 'ছায়া-মণ্ডুপি' আছে ; তা ছাড়া এখানে একটা 'আগুন সাবধানের দল' আছে।—সকলকেই কিছু-কিছু দিয়ে যেতে হবে।"

বৃন্দাবন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আগুন সাবধানের দলটি কি জিনিস ?"

বামযাদু এতক্ষণ পরে ফোজো-প্রদত্ত গেঁটে কল্কের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "কোন্ বাড়ীতে লঙ্কাকাণ্ড হ'লে তারা আগুন নিবুতে বাল্তি হাতে নিয়ে ছোটো ; বাল্তি কিন্তে তারা বরকর্ত্তার কাছে কিছু কিছু চাঁদা পায়। আপনাকেও কিছু দিতে হবে।"

বৃন্দাবন বলিল, "সকলেই কি চাঁদা দিয়ে যায় ?"

বৃন্দাবন বলিল, "হাঁ দেয় বই কি , সবাই টাকাটা সিকেটা দিয়ে যায়। ও মাসে ও পাড়ার রামজয় মিত্তিরের মেয়ের বিয়ে হলো; হাট্গাছির জমিদার ঘোষের বাড়ী বিয়ে। বরকর্ত্তার কাছে চাঁদা চাইতেই তিনি বুকের সোনার শেকল দুলিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠলেন, বল্লেন, "আগুন লেগে তোমাদের গাঁ লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাক ; আমি তোমাদের চাঁদা দেব কেন ? চলা যাও হিঁয়াসে ; কুছ্ নেহি মিলেঙ্গা।"

বৃন্দাবন সহাস্যে বলিল, "তারপর ?"

বামযাদু বলিল, "তারপর আর কি ?—ছেলেরা ফলারের সময় ঘোষজার টিকিটা ফস্ করে কেটে নিলে !—পরদিন সকাল বেলা একখান সাদা কাগজে লিখ্লে 'লঙ্কাকাণ্ডে হনুমানজিকা লাঙ্গুল' :—সেই কাগজখানায় টিকিটা বেশ করে আটা দিয়ে এঁটে রামজয় মিত্তিরের সদর দরজায় নিশেন উড়িয়ে দিল। ঘোষবুড়ো সেই থেকে ছমাস বেয়াই বাড়ী বৌ পাঠায় নি।—তামা'ক ইচ্ছে করুন।"

রামযাদু ধূম উদগীরণ পূর্ব্বক হুঁকাটি দক্ষিণ হস্তে ধবিয়া এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণহস্তের কনুই স্পর্শ করিয়া বৃন্দাবনকে হুঁকাটি দিতে গেলে, বৃন্দাবন তাহা গ্রহণ করিল না : তখন বৃন্দাবন-শ্যালক রামযাদুর হস্ত হইতে হুঁকাটি খপ্ করিয়া টানিয়া লইয়া তাহাতে দুই উৎকট দম কষিল ; তাহার পর মুখব্যাদান পূর্ব্বক ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "কলকেয় কিচ্ছু নেই। গুলে আগুন ধরে গিয়েছে।

তোমার আগুন সাবধানের দলকে ডাক, নিবিয়ে যাক্।"

ইহার পর রামযাদু নেপাল পালের বাড়ী গিয়া মথুরানাথকে দেখিয়া আসিল। বাড়ী ফিরিয়া নারায়ণীকে বলিল, "বউ, ছেলে দেখে এলাম ; হাঁ ছেলে বটে! খরিদ-বিক্রীতে ভারি লায়েক, আমাদের এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে। খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট নেই, গহনাও অনেকগুলি দেবে শুনেছি। এ ছেলে হাতছাড়া করা নয়। আঃ— সেদিন রাত্তিরে এমন 'তিলজাউ' খাইয়েছে, তার কাছে 'পোলোয়া' কোথায় লাগে ? ঘরে সাড়ে পাঁচসের দুধ হয়, তিনটে গাই দোয়া যায়। আর তাদের একটু পুকুর আছে,—তাতে যে সব কই মাছ ধরেছিল, যেন ঠিক এক একটা খেজুর গাছ্!"

নারায়ণী হাসিয়া বলিল, "খেয়েই ভুলে গিয়েছ, ঠাকুরপো!"

রামযাদু গর্ব্বিত ভাবে বলিল, "ও রকম কুঁচ্‌কি-কণ্ঠা ভরাট ক'রে খাঁট্ দিলে সবাই ভোলে, বড় বৌ!—ভশ্চায্যি ঠাকুরকে দিয়ে বিয়ের দিনটা দেখিয়ে নিতে হচ্ছে।"

রামযাদু বন্ধু সহ ভট্টাচার্য্য ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কুটীরের বারান্দায় বসিল। ভট্টাচার্য্য তখন স্নান করিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িতেছিলেন ; রামযাদুকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরামাণিকের পো! খবর কি ?"

রামযাদু বলিল, "আজ্ঞে আপনার চরণ ধোয়া হোক, বল্‌ছি ; তাড়াতাড়ি কি ?"

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য্যের একমাত্র কন্যা মনোরমা পিতার জন্য এক গাড়ু জল লইয়া আসিল।

রামযাদু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে কোনদিন আসে নাই, মেয়েটিকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "দা ঠাকুর, মেয়েটি কে ?"

মনোরমা জল রাখিয়াই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়াছিল। 'দা ঠাকুর' চরণ ধৌত করিতে করিতে বলিলেন, "ওটি আমারই ছোট মেয়ে। আহা দুধের মেয়ে, সাধ আহ্লাদ করে সনাতনপুরের গোঁসাই বাড়ী গতবৎসর বিয়ে দিয়েছিলাম ; জামাইটি 'কাব্যতীর্থ' উপাধি পেয়েছিল। চেহারায় যেন কার্ত্তিক : কিন্তু বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে জামাইটি ওলাওঠায় গত হয়েছেন।"—ভট্টাচার্য্যের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

রামযাদু তাহার সঙ্গীকে বলিল, "ওঠ হে, আর দিন ক্ষ্যাণে দরকার নেই।"

ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা উঠ্‌চো যে ? কি জন্যে এলে—তা না বলেই—"

রামযাদু সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে প্রেণাম দা ঠাকুর! আমার ভাইঝির বিয়ের

দিন দেখাতে এসেছিলাম।—আপনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, দিনক্ষ্যাণ দেখে খুব ভালদিনেই আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার ঠ্যালায় বছরও ঘুরলো না ! আর দিন-ক্ষ্যাণে দরকার নেই, চল হে ফড়ং সরকার হাটের পরদিন মেয়েটার বিয়ে দেব।"

[৪]

কিন্তু শুভদিনেই কাত্যায়নীর বিবাহ হইল। বিবাহের পরদিন আহারান্তে বৃন্দাবন বরকনে লইয়া বাড়ী রওনা হইল। যাত্রার পূর্বে বিধবা নারায়ণী ঘরে বসিয়া চোখের জলে আঁচল ভিজাইয়া ফেলিল ;—বিধবা সে, ছাদনাতলায় গেল না। রামযাদুর স্ত্রী 'সৈরবী' বরকনের বরণ করিল। রামযাদু ধানদুর্ব্বা দিয়া কাত্যায়নীকে আশীর্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মা তুই ঘরের লক্ষ্মী, আজ তোকে বিদেয় দিচ্ছি, সুখে শ্বশুর ঘর কর, কিন্তু তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকবো মা !"—বালিকা তাহার লাল চেলির মধ্যে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া চোখদুটি লাল করিয়াছিল। কাকার কথা শুনিয়া তাহার চক্ষু হইতে ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিয়া অবগুণ্ঠন ভিজাইয়া দিল। দ্বারের নিকট মলিনবসনা অশ্রুমুখী নারায়ণী দাঁড়াইয়া ছিল, কাত্যায়নী মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া পাল্কীতে উঠিবে, এমন সময় নারায়ণী উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইল, কাত্যায়নী মায়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।—নারায়ণী কোন রকমে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল, "কাঁদিস নে মা, অষ্টমঙ্গলায় তোকে নিয়ে আসবো, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাঁদাকাটা করিসনে, যেন তোর নিন্দে শুনতে না হয়।"

অশ্রুমুখী কাত্যায়নী বলিল, "তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকবো মা ! আমার বড় মন কেমন করবে।"

বেহারারা বলিল "আর দেরী করলে ইষ্টিমার পাওয়া যাবে না।"— নারায়ণী কন্যার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিল।

বেহারারা অদৃশ্য হইলে সে ঘরে গিয়া মেঝেয় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ তাহার হৃদয় শূন্য।

কাত্যায়নী যথাসময়ে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া যে আদর-যত্ন পাইল, তাহাতে তাহার হৃদয় বেদনা অনেকটা নিবৃত্ত হইল। কালিদাসী ছোট ভা-টিকে কোলে লইয়া নাচিতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল বৃন্দাবন দোকান করিয়া এ কয় বৎসরে যাহা কিছু জমাইয়াছিল, সমস্তই ভ্রাতার বিবাহে ব্যয় করিল। ভ্রাতৃ-বধূর জন্য সে গিনি

সোনার কয়েকখানি অলঙ্কারও প্রস্তুত করাইয়াছিল ; কালিদাসী তাহা সযত্নে কাত্যায়নীকে পরাইয়া দিল। বৃন্দাবনের বিধবা ভগিনী কৃষ্ণকামিনী ভ্রাতৃবধূকে কোলে টানিয়া লইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মা গো ! আজ তুমি কোথায় ? দাদার বিয়ের সময় বৌকে একখান গয়নাও দিতে পার নি ব'লে কত কান্নাই কেঁদেছিলে ; আর আজ দাদা তোমার কোল-পোঁছা ধন মথুরোর বিয়ে দিয়ে বৌকে মনের মত গহনা দিয়ে সাজিয়েছে ! আজ তুমি বেঁচে থাক্‌লে এ সব সাথ্থক হ'তো।"

বার বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ আর একটি আনন্দের দিনে প্রাণাধিকা জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে নিরলঙ্কারা দেখিয়া শাশুড়ী তাহাকে কোলে লইয়া কতই কাঁদিয়াছিলেন ; তাহা মনে করিয়া কালিদাসীর চক্ষুতেও জল আসিল। এত দিনেও সে শাশুড়ীর স্নেহ-যত্ন ভুলিতে পারে নাই।

বৃন্দাবনের পিসি তাঁহার পুত্রবধূকে লইয়া এই বিবাহোপলক্ষে ভ্রাতৃগৃহে আসিয়াছিলেন ;—পিসিমার পুত্রবধূ বিধুমুখী শিক্ষিতা, মধুরহাসিনী, রূপবতী রমণী।—তাঁহার যৌবন অতীত হইয়াছিল ; কিন্তু যৌবনের রূপরাশি তখনও ম্লান হয় নাই। তাঁহার সে রূপ দেখিয়া কাহারও মনে মোহের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা ছিল না ; তাঁহাব সে মূর্ত্তি, মাতৃমূর্ত্তি। তিনি আজ দুইমাস তাঁহার ছোট মেয়েটিকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। কন্যার বিরহে তাঁহার সুকোমল মাতৃহৃদয় নিরন্তর হাহাকার কবিতেছিল ; সেই স্নেহময়ী রমণীর হৃদয়-নিহিত ক্ষুধিত মাতৃস্নেহ স্নেহাস্পদাব অদর্শনে নিরাশ্রয় ভাবে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল ; এমন সময় সেই সুদূর পল্লীতে উৎসব-মুখর গৃহদ্বারে লাল চেলিপরা কাত্যায়নীকে দেখিয়া বিধুমুখীর মনে হইল, তাঁহার প্রাণের চারুশীলা তাঁহারই ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে. তিনি কাত্যায়নীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, "দিদি আমার মুখের দিকে তাকাও ত ? আহা, আমার চারুর মতই তোমার মুখ !"

সে স্বরে এমন কোমলতা, এত স্নেহ ও আদর মিশ্রিত ছিল যে, লজ্জা আসিয়া বাধা দিলেও কাত্যায়নী বিধুমুখীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। যে মুহূর্ত্তে সে বিধুমুখীর মুখের দিকে চাহিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার লজ্জা সঙ্কোচ ভয় দূরে গেল ; সে বিধুমুখীর কাঁধে মুখ লুকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনি কে ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমি তোমার বৌদিদি হই !"

কাত্যায়নী তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনি যে আমার মায়েব মতন ! মা আমাকে খুব ভালবাসে ; আপনি ভালবাসবেন ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমি যে ক'দিন এখানে থাকি, তুমি আমার কাছেই থেকো। তোমার মত আমার একটি মেয়ে আছে ; আজ দু'মাস সে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে।"

কাত্যায়নী বলিল, "আমাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবেন ?"

বিধুমুখী বলিলেন, "যাব, আর এক সময়। এখন ত আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হবে না, তুমি বিয়ের কনে কি না।"

বিধুমুখী বৌ-ভাতের দিন পর্য্যন্ত মামা-শ্বশুরের বাড়ীতে ছিলেন। যে দিন তিনি বাড়ী চলিয়া যান. সে দিন তাঁহার কোলে উঠিয়া কাত্যায়নী যেমন কাঁদিল, মায়ের নিকট বিদায় লইবার সময় ভিন্ন সে তেমন করিয়া আর কোন দিন কাঁদে নাই। সে কাঁদিতে-কাঁদিতে বিধুমুখীকে বলিল, "মা আমাকে ছেড়ে আছেন, আপনিও ছেড়ে চল্‌লেন ! আমি কা'র কাছে থাক্‌বো ?"

কালিদাসী কাত্যায়নীকে কোলে লইয়া বলিল. "কেন দিদি, তুমি আমার কাছে থাক্‌বে। ঘরের লক্ষ্মী, তোমার 'পয়ে' আমাদের সোনার সংসার হবে। আমরা দু'টি বোনে সংসার করবো। আমার খুকীর তুমি যে ছোট মা।"

সে আবার খুকীর মা ! চোখে জল, কিন্তু দিদির কথা শুনিয়া তাহার ওষ্ঠে হাসি ফুটিল। যেন এক পশলা বৃষ্টির মধ্যে রোদ উঠিল।

কালিদাসী বলিল, "দিদির আমার চোখের জলও যেমন মিষ্টি, হাসিও তেমনই মিষ্টি ! আহা, মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে, চল কিছু খাবে।"

অষ্টম স্তবক

বিপত্নীক

[১]

নন্দীগ্রামের বিশ্বরূপ কুণ্ডু ভগিনীপতি-গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিল। বাসুদেবপুরের ধনাঢ্য মহাজন নিতাই পালের সহিত বিশ্বরূপের ভগিনী গঙ্গামণির বিবাহ হইয়াছিল, গঙ্গামণিই পিতৃমাতৃহীন অনাথ ভাইটিকে স্নেহে-যত্নে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। বাসুদেবপুরের অদূরবর্ত্তী হরেমপুরে (হরিরামপুর) নিতাই পালের প্রকাণ্ড আড়ত ছিল। বিশ্বরূপ সেই আড়তে থাকিয়া রীতিমত 'ব্যবসাদার' হইলে গঙ্গামণি তাহাকে কিছু 'পুঁজি' দিয়া নন্দীগ্রামে একখানি 'পসরহাট্টার' দোকান খুলিয়া দিলেন।—এই মুদীখানাই বিশ্বরূপের উন্নতির সোপান।

গঙ্গামণি পূর্ব্বেই বিশ্বরূপের বিবাহ দিয়াছিলেন। দিদির আদেশে দীর্ঘকাল পরে সে সস্ত্রীক পৈত্রিক ভিটায় আসিয়া বসিল, এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত দোকান চালাইতে লাগিল। বহুকাল পরে পৈত্রিক ভিটায় সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিতেছে, একথা শুনিয়া গঙ্গামণি জীবন সফল মনে করিলেন। পল্লীরমণীগণ বলাবলি করিত—"গঙ্গামণি সাথ্থক নিতাই পালের গলায় মালা দিয়েছিল।"—কিন্তু নিতাই পালের জ্যেঠতুতো ভাই রামকানাই পাল সন্ধ্যাকালে তাহার কাপড়ের দোকানে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিবার পূর্ব্বে শ্রোতৃবৃন্দকে নিতাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতার কাহিনী শুনাইতে-শুনাইতে প্রায়ই বলিত, "যে সংসারে মেয়েমানুষ কর্ত্তা, সে সংসারের কি আর ভাষ্যি আছে? নিতাই টাকাগুলো দিয়ে শেষে কি না সম্বন্ধীর পেট ভরালে হে! বিশের দোকানে কি কম টাকাটা খাটচে? বিশেটা নেতার সংসারে ছুঁচ হয়ে ঢুকেছিল, ফাল্ হয়ে বেরিয়েছে!—টেরটা পাবেন শেষে ভায়া।"

রামচরণ সা হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিল, "হরি হে তোমারই ইচ্ছে! নিতাই পালের মত বোনাই পাওয়া পূর্ব্ব জন্মের অনেক পুণ্যির ফল। দেখ্তে দেখ্তে দোকান খানা পাকা করলে; শুনেছি বাড়ীতে দুখানা 'চৌরী' ঘরের ইটের পাঁচিল দিয়েছে, আর 'হালফিল' পরিবারের জন্যে সোনার কণ্ঠমালা গড়িয়েচে। মোড়ের উপর দোকান কি না, ভারি জবর কাটতি! মা লক্ষ্মী বিশের ওপর মুখ তুলে তাকিয়েছেন।"

হরিবোলা দাস-বৈরাগ্য বামহস্তে ভুঁড়িতে হাত বুলাইয়া, 'রাধাকৃষ্ণ' নামাঙ্কিত লালরঙের হরিনামের ঝুলিটির ভিতর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দিয়া মালাগাছটি সবেগে ঘুরাইতে-ঘুরাইতে দাড়িগোঁফ-বর্জ্জিত শুভ্র দন্তপংক্তিবিকশিত মুখে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের অবতারণা করিয়া বলিল, "আরে ওরকম বোনাই হ'লে মা লক্ষ্মী সকল সুম্মুন্দির ওপরই মুখ তুলে তাকিয়ে থাকেন। দোকান ঘর পাকা করা ত তুশ্চু কথা, বাড়ীতে দোমহলা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়।—কি বল গো রামকানাই দাদা। পরিবারের কণ্ঠমালা হয়েছে, এদিকে দুয়োরে ফকির বোষ্টম গেলে ত একমুঠো চাল পায় না! অমন টাকা থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি?—হরি হে তোমারই ইচ্ছে।"

বিশ্বরূপের উন্নতি দেখিয়া গ্রামের অনেক লোকেরই চোখ টাটাইতে লাগিল। অনেকেরই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, বুঝি তাহা নিতান্ত নিষ্ফলও হইল না। বিশ্বরূপ যখন বেশ গুছাইয়া উঠিল, তাহার স্ত্রী পাতানীর জন্য সোনার 'নারিকেল ফুল' গড়িতে দিল, সেই সময় একদিন মৃত সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকাগৃহেই পাতানী মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। একে 'আঁতুড়ে পোয়াতি', তাহার উপর মৃত সন্তান প্রসূত হইয়াছে,—গ্রামে যে দুই একজন আত্মীয় স্বজন ছিল—তাহাদের গৃহলক্ষ্মীরা পাতানীকে স্পর্শও করিল না। পাতানী অসহ্য যন্ত্রণায় 'জল' 'জল' করিয়া 'কাত্‌রাইতেছে' দেখিয়া বিশ্বরূপ আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জলপান করাইল, তাহার পর পাতানীর মাথাটি ময়লা ছেঁড়া বালিশটার উপর হইতে সাবধানে তুলিয়া নিজের হাঁটুর উপর রাখিয়া পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তাহার চোখ হইতে টস-টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গত বারো বৎসরের মধ্যে পাতানীর সহিত একদিনের জন্যও তাহার ছাড়াছাড়ি হয় নাই। পাতানীকে সে ভালবাসিত কি না—সে কথা কোনদিন তাহার মনে উদিত হয় নাই। পাতানী সংসার লইয়া থাকিত, বিশ্বরূপ দোকান লইয়া থাকিত; সংসার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা ভিন্ন স্ত্রীর সহিত তাহার অন্য কথা প্রায়ই হইত না। পাতানী তাহাকে ভাত জল দিত; সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা সে পাতানীকে আনিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইত; কিন্তু সংসারটা তাহার বড় ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিত: সে দোকানে বসিয়া প্রায়ই দেখিত, কোন-না-কোন উৎসব উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সাজ পোষাক করিয়া পূজাবাড়ীতে দল বাঁধিয়া ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে। তখন তাহার মনে হইত, ঐ রকম একটি সোনার চাঁদ ছেলে যদি তাহার থাকিত, তাহা হইলে তাহার সকল আপ্‌শোষ দূর হইত।—বিবাহের পর সুদীর্ঘ বারো বৎসরের মধ্যে সে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে পায় নাই; অবশেষে যদি বা মা ষষ্ঠী প্রসন্না হইলেন, কিন্তু এ কি বিভ্রাট!—পাতানী যদি না

বাঁচে, তাহা হইলে সে কাহাকে লইয়া সংসার করিবে ?—বিশ্বরূপেব মনে হইল, পাতানী তাহার পাঁজবেব একখানি হাড়ের মত, যতক্ষণ তাহা আছে—ততক্ষণ তাহার অস্তিত্বের কথাই মনে হয় না, কিন্তু তাহা খসিয়া পড়িলে প্রাণবক্ষা হয় না। বিশ্বরূপের ধারণা হইল—তাহাব পাঁজর খসিয়া পড়িতেছে !

বিশ্বরূপ পাখা রাখিয়া পাতানীর ললাটের উপর হইতে রুক্ষ কেশগুলি সরাইয়া দিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "পাতানী, তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাকবো ?"

পাতানী যন্ত্রণাভরে মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল, "উঃ বড় তেষ্টা ' জল, ওগো, আমাকে একটু জল দাও।"

বিশ্বরূপ চক্ষু মুছিয়া তাহার মুখে দুই ঝিণুক জল দিল , পাতানী চক্ষু মুদিয়া ছট্‌ফট্‌ কবিতে লাগিল।

ডাক্তার—শবদিন্দুপ্রকাশ বক্সী, ভি-এল-এম্-এস্। তিনি ক্যাম্বেল হইতে পাস করিয়া আসিয়া গ্রামে ডিস্‌পেন্সারী খুলিয়া বসিয়াছিলেন ; খুব পসার।— কঠিন রোগে তিনি দুই টাকা ভিজিটের কমে রোগী দেখিতে যান না, এবং এই দুই টাকার জন্য সকল রোগকেই কঠিন বলেন ! জ্বর হইলে তিনি তাঁহাব আবিষ্কৃত 'ম্যালেরিয়ার মৃত্যুবাণ' নামক চূর্ণের ব্যস্থা করিতেন। যাহার পরমায়ুর জোর থাকিত—সে সারিয়া উঠিত। অনেকেই মরিত। যাহারা মরিয়া 'ম্যালেরিয়ার মৃত্যুবাণ' ও তাহার আবিষ্কারক ডাক্তার বক্সীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন, "উহার কালাজ্বর হইয়াছিল, শিবের অসাধ্য ব্যাধি ! ডাক্তার হল্‌ওয়েল তাঁহার 'মেডিক্যাল হাইড্রোমেটারে' লিখিয়াছেন—কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ এখনও 'ডিস্কভার' হয় নাই।—আমি 'হুতাশন হিমাঙ্গরস' পর্য্যন্ত দিয়া দেখিয়াছি, কালাজ্বরে কোন ফল পাওয়া যায় না। ডাক্তার ক্যাম্‌ব্রিজ বলেন, উহার চিকিৎসা নাই।"

বিশ্বরূপ পূর্ব্বেই ডাক্তার বক্সীকে খবর পাঠাইয়াছিল। ডাক্তার তাঁহার 'সাইক্লে' চড়িয়া বিশ্বরূপের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তাহার পর গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত নবনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন। এই কুটীরখানিই পাতানীর 'আঁতুড ঘর।'—তাহা আঁতুড় ঘর বলিলেও চলে—শস্যক্ষেত্রে পাহারা দিবার জন্য দুই খানি ক্ষুদ্র খড়ের চালা একত্র করিয়া যে 'টোঙ' বাঁধা হয়, সেই টোঙ্‌ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার চারিদিকে টাটি, কোনও দিকে বায়ু চলাচলের পথ নাই ; সম্মুখে দুই হাত দীর্ঘ ও দেড় হাত প্রশস্ত ঝাঁপের দুয়ার। কাদা দিয়া আধ হাত উচ্চ 'মেঝে' প্রস্তুত করা হইয়াছে ; রৌদ্র ও বায়ুর সংস্পর্শ না থাকায় তাহা শুকাইতে পায় নাই, তাহা দিয়া জল উঠিতেছে।—সেই মেঝের উপর একখানি

ছেঁড়া মাদুরে পাতানী পড়িয়া আছে ; এক পাশে অগ্নিকুণ্ড,—গম্‌-গম্‌ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। মাথার কাছে শোণিত ক্লেদাদিসিক্ত ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি। দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।সুস্থ লোক সেই নবককুন্ডে পাঁচ মিনিট বসিয়া থাকিলে দম্‌ আট্‌কাইয়া মরণাপন্ন হয়।—ইহাই পল্লীগ্রামের সূতিকাগার ! এই দুর্গন্ধ-দূষিত অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারময় বায়ুসমাগমশূন্য নবককুণ্ড বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ আশার অরিষ্ট শয্যা ! ডাক্তার নাকে রুমাল দিয়া বলিলেন, "এখানে থাক্‌লে পোয়াতী একদণ্ডও বাঁচ্‌বে না। শীঘ্র একে বা'র করে' বাসের ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।"

বিশ্বরূপ বলিল, "তা কি করে হবে ? ষষ্ঠী পুজো না হলে কি পোয়াতীকে আঁতুড় ঘর থেকে বেরুতে আছে ?"

বিশ্বরূপের পিসি ডাক্তারের কথা শুনিযা বিস্ময়ে গালে হাত দিলেন : অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "অবাক কাণ্ড ! আমাদের হিঁদুর বাড়ীতে ও সব খৃষ্টানী মত চল্‌বে-টল্‌বে না। চিরকাল ত এই রকমই হয়ে আস্‌চে। খালাস হ'তে-নাহ'তে পোয়াতীকে কে আবার বাসের ঘরে নিয়ে যায় ? গেরস্তর কি এত অনাচার সহ্য হয় ?"

পাতানীর তখন ঔষধ গলাধঃকরণের শক্তি ছিল না। ডাক্তার তাহার চামড়া ফুটা করিয়া পিচ্‌কারীর সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন ; তাহার পর ভিজিটের টাকা দুইটি পকেটে ফেলিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই নরককুণ্ডের বাহিরে আসিযা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।---পাতানীও ঘণ্টাদুই পরে স্বামীর উরুদেশে মাথা রাখিয়া চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল। বিশ্বরূপ কাঁদিতে-কাঁদিতে বাহিরে আসিল।

তখন মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য লোকজন ডাকিবার ধূম পড়িয়া গেল। গ্রামে বিশ্বরূপের স্বজাতি ও আত্মীয় দুই চারি ঘর ছিল ; তাহারা বিশ্বরূপের দোকানে আসিয়া সন্ধ্যার সময় দশ-পঁচিশ খেলিত, তামাক খাইত ; সময়ে সময়ে বিশ্বরূপের নিকট হইতে দশ সের চাউল, আধসের লবণ, দুই এক বোতল কেরাসিন তেল ধার করিয়া লইয়া যাইত ; অভাবে পড়িয়া টাকাটা সিকিটাও কর্জ্জ লইত ; এবং অন্নপ্রাশন, বিবাহ বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কোন স্বজাতীয়ের গৃহে 'কুটুম্বিতা'র সম্ভাবনা দেখিলে—কোন্‌ শত্রুকে কি উপায়ে একঘরে করা যায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বিশ্বরূপের দোকানেই তাহাদের বৈঠক বসিত।—বিশ্বরূপের আশা ছিল, এই দুঃসময়ে সে এই সকল হিতৈষী আত্মীয়ের সহায়তা পাইবে ; কিন্তু তাহাকে দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া নিরাশ হইতে হইল। বটকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া তাহার শোকে সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক

বলিল, "কি কবি ভাই, আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, আমাকে ত যেতে নেই ; আমার যেতে থাক্‌লে এক্ষুনি গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম ।"—নিধিরাম বলিল, "কাল রাত্রি থেকে আমার পেল্লাই জ্বর ; এখনও মাথা কামড়ে ছিঁড়ে পড়ছে, গা গতরে বেদনা ! জ্বর গায়ে কি করে শ্মশানে যাই ? তা না হলে তোমার এমন বিপদ, আমাকে কি বলতে হয় ?"—নিধিরাম লেপ গায়ে দিয়া চৌকির উপর শয়ন করিয়া হি-হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

বিশ্বরূপ অগত্যা গোবিন্দ প্রামাণিকের শরণাপন্ন হইল। গোবিন্দ বলিল, "আমি ভাই পরের চাকর, এই দেখ রামচন্দোরপুরে তাগাদার চলেছি ! যে মনিবের চাকরী করি—হুকুম তামিল না হলে আর রক্ষে নেই, চাকরীটুকু থাক্‌বে না। কচি-কাচা নিয়ে তখন কোথায় যাব ?"—গোবিন্দ প্রামাণিক একখানি চাদর কাঁধে ফেলিযা ফস করিয়া তাগাদায় বাহির হইল।

বিশ্বরূপ হতাশভাবে আরও তিন চারিজন আত্মীয়ের বাড়ী ঘুরিল, কিন্তু কেহই তাহার সাহায্যে অগ্রসব হইল না।—অবশেষে পরমানন্দ সরকারের বিংশতি বর্ষ বযস্ক পুত্র দৈবকীনন্দন পিতামাতাব নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বরূপের সঙ্গে চলিল। দৈবকীনন্দন মহকুমার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত। ছুটি লইয়া সে বাড়ী আসিয়াছিল। তাহার মা বলিলেন, "আঁতুড়ে পোয়াতী মরেচে, প্রাচিত্তির করে নি—তুই ছেলেমানুষ, তাকে শ্মশানে নিয়ে যাবি ? ভাল আছে মন্দ আছে, ও কাজ ককখনো করিস নে। নিজের ভাল আগে দেখতে হয়।"

দৈবকীনন্দন কোমরে গামছা বাঁধিতে-বাঁধিতে বলিল, "বিপদ-আপদ ত সকলেরই আছে মা ! আজ যদি ওঁর বিপদ দেখে আমরা মুখ ফিরিয়ে বসে থাকি, তবে কাল আমাদের বিপদের সময় উনি কেন আস্‌বেন ? মরতে ত সকলকেই হবে। আত্মীয় কুটুম্ব থাকতে শেষে কি আমাদের স্বজাতির মড়া মুদ্দফরাস্ দিয়ে ফেলতে হবে ?"

মা বলিলেন, "কি যে বলিস্ অলুক্ষুণে ছোঁড়া কোথাকার ! বিপদ-আপদে ডাক্‌লে আসবে না বলে নিজের অকল্যাণ করতে হবে ?—লেকাপড়া শিখে দিন দিন তোর 'বুদ্দি সাদ্দি' লোপ পাচ্চে। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে।"

"হাঁ মা, কিন্তু আমার পাগল হতে এখনও বিলম্ব আছে,"—বলিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।—তাহার পিতা পরমানন্দ পুত্রের এতাদৃশ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে

লাগিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া বলিলল, "ঘোর কলি! এ কালের ছোঁড়াগুলোর আর 'ভাম্যি' নেই।"

[২]

বাঙ্গালাদেশের কোন কোন জেলায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র হিন্দু-পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে, সৎকারের জন্য আজকাল মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহাদের যথেষ্ট অর্থ আছে, তাহারা স্বজাতীয় নিষ্কর্ম্মা নিরুপায় নেশাখোরদিগকে মদের বোতল বা গাঁজা-গুলি খাইবার জন্য দুই চারি আনা দিয়া বশীভূত করিতে পারে; মৃতব্যক্তি 'বাঁশের দোলায়' উঠিয়া জাত-বেহারার কাঁধে চড়িয়া শ্মশান-ঘাটে যাত্রা করে। নিতান্ত অনুগত নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীরা শবদাহের জন্য জ্বালানী কাঠ, খড়, চৌচালী, খড়ি প্রভৃতি আঁটি বাঁধিয়া মাথায় তুলিয়া লয়, এবং কণ্ঠস্থিত তৈলপক্ক কাঠের মালা খুলিয়া রাখিয়া, কোমরে গামছা জড়াইয়া, 'থেলো' হুঁকায় তামাক টানিতে-টানিতে শববাহকগণের অনুসরণ করে। কিন্তু যাহাদের তেমন অর্থবল নাই, গ্রামে অধিকসংখ্যক আত্মীয়-কুটুম্ব নাই; বাড়ীতে কেহ মরিলে তাহাদের বিপদের সীমা থাকে না। বিশ্বরূপ কুণ্ডুর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলেও স্ত্রীর মৃতদেহ লইয়া তাহাকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইল। দৈবকীনন্দন পরোপকারী যুবক, সে পাতানীর মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য বিশ্বরূপের গৃহে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু বিশ্বরূপ তিন চারিঘণ্টাকাল গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়াও অধিকারী পাড়ার তিনকড়ি দে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পাইল না। তিনকড়ির বয়স হইয়াছিল, তাহার ঘর-বাড়ী ছিল না। তাহার একটি 'অবিদ্যা' ছিল, নাম পাঁচি; তিনকড়ি তাহারই কুটীরে বাস করিত। অবিদ্যাটি বোষ্টমের মেয়ে। সে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইত, তাহাতে উভয়েরই জীবিকা নির্ব্বাহ হইত; এতদ্ভিন্ন পাঁচি নানা উপলক্ষে গ্রামস্থ গৃহস্থদের কুটুম্ব বাড়ীতে মধ্যে-মধ্যে তত্ত্ব লইয়া যাইত; কাহারও কন্যার বিবাহোপলক্ষে সে নব-বিবাহিতা বালিকার ঝি সাজিয়া দুই পাঁচ দিনের জন্য তাহার সঙ্গে তাহার শ্বশুরবাড়ী যাইত, ইহাতেও তাহার দুই এক টাকা উপার্জ্জন হইত। তিনকড়ি যে বসিয়া-বসিয়া পাঁচির অন্ন ধ্বংস করিত ও দেহতত্ত্বের গান শুনাইয়া তাহাকে খুসী করিত, এরূপ নহে; সে নন্দীগ্রাম ও তৎসন্নিহিত পল্লীসমূহে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া গৃহস্থদের পাতকুয়া হইতে ঘড়া ঘটী তুলিয়া দিয়া দুই চারি আনা উপার্জ্জন করিত; কাজকর্ম্ম মন্দা পড়িলে মাথায় একখানি নামাবলি জড়াইয়া এক পায়ে পিতলের বিবর্ণ ঘুঙুর বাঁধিয়া, একটা 'গাবগুবাগুব'

(গোপীযন্ত্র) হাতে লইয়া গ্রামের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িত, এবং অসঙ্কোচে গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বাঁশের চটা দিয়া 'গাবগুবাগুবে'র তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়া মাথা নাড়িয়া নাচিতে-নাচিতে মোটা গলায় গায়িতে আরম্ভ করিত---

"এস্যা এক রসিক পাগল, বাদালে গোল
নদ্যার মাঝে দ্যাখ্‌সে তোরা !
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব
হেরবো রসের লবগোরা ।"

সদাশয়া পল্লীরমণীগণ তাহার গান শুনিয়া কেহ আধ 'পাখি' চাউল, কেহ দুই একটি পয়সা, কেহ বা চিঁড়া মুড়ি দিয়া তাহাকে বিদায় করিত। এই ভাবে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইলে সে প্রথমে শিবু সা'র দোকানে গিয়া দুই চারি পয়সার গঞ্জিকা ক্রয় করিত ; তাহার পর দুই একজন গাঁজাখোরকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া পাঁচির কুটিরে ঘটা করিয়া বৈঠক বসাইত ! পাঁচি রাগ করিত, গালি দিত ; কিন্তু তিনকড়ি পরম সহিষ্ণুচিত্তে পাঁচির গালাগালি পরিপাক করিয়া, কচু সিদ্ধ ও শাকভাজা দিয়া এক পাথর ভাত গিলিতে বসিত। পাঁচির হাতে খাইত বলিয়া স্বজাতীয়েরা তাহাকে একঘরে করিয়া রাখিয়াছিল। বিশ্বরূপ লোক সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হইয়া অগত্যা এই তিনকড়ির শরণাপন্ন হইলে সে দুই এক আনার গাঁজার লোভে মৃতদেহ বহিয়া শ্মশানে যাইতে সম্মত হইল।

তিনকড়িকে দেখিয়া বিশ্বরূপের পিসিমা বলিলেন, "তুই যে তিনুকে নিয়ে এলি, ও ত একঘরে ! কুটুম্বেরা শেষে যদি তোকেও একঘরে করে, তখন সামলাবি কি করে ?"

বিশ্বরূপ বলিল, "তা একঘরে করে করবে। যারা একঘরে করবে, তারা কি আমার এই বিপদে একবার টুকি দিয়ে দেখ্‌লে ? অমন একঘরের মুখে মারি ঝাঁটা। এতবড় বিপদের সময় যারা একবার 'আহা' বল্লে না ; কি করে এ দায় থেকে উদ্ধার হব তা বিবেচনা কল্লে না, তেমন কুটুম থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি ?---থাকি থাক্‌বো একঘরে হয়ে ; এবার জেতের মুখে নাথি মেরে ভেক্ নিয়ে বোষ্টম হব, তারপর সব বেচে কিনে ছিরি বিন্দাবনে চলে যাব। আমার চাল না চুলো---ঢেঁকি না কুলো ; পাতানীই যখন চলে গেল, তখন আর কার জন্যে সংসারে থাকবো ?"

তিনজনে ধরাধরি করিয়া মৃতদেহ বাহির করিল ; কিন্তু তিনজনের পক্ষে তাহা

শ্মশানে বহিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। নিরুপায় বিশ্বরূপ দুঃখে কষ্টে মর্ম্মবেদনায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। অতঃপর কি যে করিবে, তাহা স্থির কবিতে না পারিয়া সে তুলসী-বেদীর কাছে ধুলায় বসিয়া পড়িল, এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এতবেলা পর্য্যন্ত মৃতার "গঙ্গা" হইল না—ইহাতে বিশ্বরূপের প্রতিবেশী দুই একজন আত্মীয় ভয়ানক চটিয়া গেল। কেহ কেহ বিশ্বরূপের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় ও অপদার্থতায় অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করিয়া, আহারান্তে নিশ্চিন্ত চিত্তে তাম্বুল চর্ব্বণ কবিতে কবিতে হুঁকা টানিতে লাগিল। বিশ্বরূপের নিকট-প্রতিবেশী ও আত্মীয় শ্রীকান্ত মণ্ডলের স্ত্রী অপরাহ্নে কাঁথা সিলাই করিতে করিতে তাহাব ননদকে বলিল, "ঠাকুরঝি, বিশে মিন্‌সেব আক্কেল দেখেছিস্? বৌটা সেই শেষ রাত্তিরে মরেছে, বেলা 'শেষিয়ে' এলো, এখনও পয্যন্ত গঙ্গা দেবার নামটি নেই! হাড়ি ডোমও এত বেলা পর্য্যন্ত মড়া ঘরে ফেলে রাখে না। এতে যে গাঁয়ের 'অকল্যেণ'! মিন্‌সের ত অনেক পয়সা, কে খাবে?—অমন পয়সার কপালে আগুন!"

বিধবা ননদ ভ্রাতৃবধূব মনোরঞ্জনের আশায় দন্তরুচি-কৌমুদী বিকাশ করিয়া সহাস্যে বলিল, "শুধু কি পয়সায় আগুন, মিন্‌সের মুখে আগুন, না?—ওরা মুচি মুদ্দোফরাসের অধম! এবার যেন দাদারা পাঁচঠাকুব বৈঠক করে ওকে একঘরে করে রাখে। আবার সক্কাল বেলা দাদার কাছে এসে বলা হচ্ছিল, 'তুমি আমার আপনাব নোক, এ দায়ে কাঁধ না দিলে আমি নিরুপায়!"—ওরে আমার আপনার নোক: পিঠে খান ফোঁড় গোণেন না। সেদিন দাদার হাতে টাকা ছিল না, বল্লে—'এক মণ চাল দাও, দামটা পরশু মিটিয়ে দেব।'—তাতে উত্তর দেওয়া হল, আমার কি বাপের ক্ষেতের ধানেব চাল? ধারে-টারে দিতে পারবো না; এখনও তোমার কাছে বিশ পঁচিশ টাকা বাকী পড়ে আছে, তা শোধ করবার নাম নেই, আবার ধার!' দাদা আমার মুখটি চুণ করে বাড়ী এলেন। এত অপমান! ভগবানেব কি বিচের নেই? তারপর দশ দিনও গ্যালো না।"

বৌ বলিল, "বেহায়া মিন্‌সে, আবার আমার দোরে আস্‌তে নজ্জা হয় নি? তোমার দাদার কাজ নেই, তাই আঁতুড়ে মড়া ঘাড়ে নিয়ে গঙ্গা দিতে যাবে!—আমাকেও ত দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সংসার কত্তে হয়। ভূতোর মা বলছিল, ও পাড়ার তিনে পাগ্‌লাকে মড়া ঘাড়ে নিতে ডেকে এনেছে! নাঃ, জাত-কুল আর কিছু থাক্‌লো না। এবার বিশে কুণ্ডুকে একঘরে না করে আর ছাড়াছাড়ি নেই।—ঠাকুরঝি, ছুঁচটায় সূতো পরিয়ে দাও ত ভাই, আমার ভাল নজর চলচে না।"

ঠাকুরঝি দক্ষিণ হস্তে চিবুক স্পর্শ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "হ্যাঁ বৌ, তুমি যে আমার দশ বচ্ছরের ছোট ; তোমার আবার বয়স কি ? তোমার নজর চল্‌চে না ! আমাকে যে অবাক্ করে দিলে। শেষে কবে বল্‌বে তোমার দাঁত নড়চে।"

"আর বোন বুড়ো হতে আর বাকি কি !"—বলিয়া গতযৌবনা কাদম্বিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। ইতিমধ্যে বিশ্বরূপের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল।—কাদম্বিনী বলিল, "এতক্ষণে বুঝি নিয়ে যাচ্ছে ! কে কে গেল শুনতে পেলাম না। ছেরাদ্দ কতদূর গড়ায় তার ঠিকানা কি ?"

[৩]

তিনজন লোকে মৃতদেহ বহিয়া গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতীরস্থ শ্মশানে লইয়া যাইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নিরুপায় হইয়া বিশ্বরূপ হতাশভাবে রোদন করিতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের আর অধিক বিলম্ব ছিল না ; আকাশে মেঘও অল্প অল্প করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। তিনকড়ি অতঃপর কি করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিশ্বরূপের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে দুই ছিলিম গাঁজা উড়াইল। তাহার পর এদিকে-ওদিকে চাহিয়া—সেখানে তাহার প্রসাদ পাইবার কেহ নাই দেখিয়া গেঁটে কলিকাটি ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া 'খুঁটি'র পাশে নামাইয়া রাখিল, কয়েক মিনিট পরে কলিকাটি ঠাণ্ডা হইতে তাহা 'করচে' গুঁজিয়া দৈবকীনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী ভাই, এখন কি করা যায় ? যত শালা কুটুম ফলারের সময় আণ্ডা-বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে নুচি বসান দিতে আসবে। কাঁধে বাঁশ নেবার বেলা সব ভেড়োর পরিবার অন্তঃসত্ত্বা হয় : নুচির ফলারের বদলে ওদের মুখে বাসি 'আকার' ছাই দিতে হয় !"

দৈবকীনন্দন বলিল, "তোমার ছরাদ্দের সময় সেই ব্যবস্থাই করা যাবে। এখনকার ব্যবস্থা কি তাই ভাবো। তুমি এখানে বসে থাক, আমি একবার গরুর গাড়ীর খোঁজ নিয়ে আসি। গরুর গাড়ীতে তুলে নিয়ে শ্মশান ঘাটে যাওয়া-ছাড়া কোন উপায় দেখ্‌চি নে। আত্মীয় কুটুম্ব আর কেউ এদিকে ভিড়্‌চে না।"

দেবকীনন্দন কোমরের গামছা খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া চট করিয়া বিশ্বরূপের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল ; প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে সে আর ফিরিল না। সন্ধ্যা অতীত হইল। বিশ্বরূপের আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বলিল না। সমগ্র বাড়ীখানি শোকের অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হইয়া মেঘান্ধকারপূর্ণ নৈশ আকাশতলে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল : কেবল বিশ্বরূপের বৃদ্ধা পিসিমা অবসন্ন দেহে ঘরের দাওয়ায়

পড়িয়া এক একবার বিদীর্ণ কণ্ঠে বলিতেছিলেন, "মাগো, তোর মনে কি এই ছিল ?—কার মুখ চেয়ে আর এ 'শশানে' থাকবো মা ! এই বুড়ীর মুখের দিকে তাকাতে সংসারে আর যে কেউ নেই মা !"

ঘণ্টাদুই পরে দৈবকীনন্দন গোয়ালপাড়া হইতে দুইখানি গরুর গাড়ী লইয়া আসিল। একখানি গাড়ী অতি জীর্ণ, চাকা দু'খানি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কোনরূপে দাঁড়াইয়া আছে; দৈবকীনন্দন সেই গাড়ী পনের টাকায় কিনিয়া লইয়া আসিল। আর একখানি গাড়ী কাঠ বহিবার জন্য দেড় টাকায় ভাড়া করিয়াছিল। অন্য সময় দেড় ক্রোশ যাইতে তাহার ভাড়া আট আনার অধিক হইত না, কিন্তু গাড়োয়ান গরজ বুঝিয়াছে ; সে দেড় টাকার একপয়সা কম লইতে রাজী হইল না। দৈবকীনন্দন বলিল, "বিশুদা, টাকা কোথায় ! ওদের টাকা আগে মিটিয়ে দিতে হবে ; সেই কড়ারে গাড়ী নিয়ে এসেছি।"

বিশ্বরূপ দৈবকীনন্দনকে তাহার হাতবাক্সের চাবিটা দিল। দৈবকীনন্দন বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিল। গাড়োয়ানদ্বয়কে তাহাদের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিয়া, ভাড়াটে গাড়ীখানার উপর কাঠ সাজাইয়া লইল। তাহার পর দুইটি মশাল ও একটা হেরিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া, বিশ্বরূপ ও তিনুর সাহায্যে মৃতদেহ সেই ভাঙ্গা গাড়ীতে তুলিয়া শ্মশানে চলিল। তাহাদের কণ্ঠোচ্চারিত "বল হরি, হরিবোল" শব্দ শুনিয়া গ্রামের লোকেরা বুঝিল, এতক্ষণে গঙ্গাযাত্রার একটা উপায় হইয়াছে। পাছে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করে, এই ভয়ে কেহ ঘরের বাহির হইল না। তাহারা তিনজন ও দু'জন গাড়োয়ান—এই পাঁচজনে সেই মেঘাচ্ছন্ন-রাত্রে অরণ্য-পরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী কাজলা তীরস্থ শ্মশানাভিমুখে চলিতে লাগিল।

এই দেড়ক্রোশ পথ তাহাদের দশ ক্রোশের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল ; পথ আর ফুরায় না। গ্রামের বাহিরে মাঠ, কোথাও চষা ক্ষেত, কোথাও 'আচট' জমি ; মৃতদেহ ও কাঠের বোঝা লইয়া গরুর গাড়ী দুইখানি চক্রশব্দে স্তব্ধ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া অতি মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল।

শ্মশানে উপস্থিত হইতে রাত্রি দশটা বাজিল। শৈবাল-সমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র নদী, তীরে বহুদূরব্যাপী শ্মশান। যতদূর দৃষ্টি যায়—কেবল মাঠ, মাঠের পরে মাঠ ! শ্মশানঘাটের ঠিক উপরেই একটা শিমুলগাছ, আকাশে শাখা-বাহু প্রসারিত করিয়া বিকটাকার প্রেতের ন্যায় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। জলের ধারে পাঁচ-সাতটা শিয়াল একটা অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতেছে,—পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক 'খ্যাক্'-'খ্যাক' শব্দে শ্মশানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। মশালের আলো দেখিয়া তাহারা একটু দূরে সরিয়া গেল। 'হরিবোল' শব্দ শুনিয়া কয়েকটা কচ্ছপ

জলেব ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া আগন্তুকদের দিকে চাহিয়া রহিল। চারিদিকে কত যে মড়ার মাথা পড়িয়া আছে, তাহার সংখ্যা হয় না! শ্বেতবর্ণ অস্থিরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কোথাও একটা বালিশ পড়িয়া আছে, শৃগালে তাহা ছিঁড়িয়া তূলা বাহির করিয়াছে; কোথাও কাঁধ-ভাঙ্গা মাটির কল্‌সী; কোথাও ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর; কোথাও আধপোড়া কাঠ; চিতাভস্মের নিকট সুদীর্ঘ বংশ-দণ্ড!

দৈবকীনন্দন ও তিনু মশালের আলোকে একটি স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া চিতা সাজাইল; বিশ্বরূপ মুখাগ্নি শেষ করিয়া, মাটীতে লুটাইয়া শিশুর মত রোদন করিতে লাগিল। গাড়োযানদ্বয় তাহাকে কোন রকমেই থামাইয়া রাখিতে পারিল না। অপর-জাতীয় লোককে চিতা স্পর্শ করিতে দেওয়া উচিত নহে মনে করিয়া, দৈবকীনন্দন শবদাহ কার্য্যে গাড়োয়ানদ্বয়ের সহায়তা গ্রহণ করিল.না। তাহার বয়স অল্প, দুই একবার মাত্র সে শবদাহ করিতে শ্মশানে আসিয়াছিল; কিন্তু তিনু এ কার্য্যে ওস্তাদ। —দেখিতে দেখিতে পাতানীর নশ্বর দেহ ভস্মে পরিণত হইল।

শবদাহ শেষ হইলে তিনুই এক কল্‌সী জল ঢালিয়া চিতাভস্ম ধৌত করিল; পল্লীগ্রামে হিন্দুপরিবারের শবদাহে কোন্-কোন্ অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য, তাহা তিনুর বিলক্ষণ জানা ছিল। এই কার্য্যে দীর্ঘকাল হইতেই তাহার অভিজ্ঞতা। মড়া কাটিতে ডাক্তারের যেমন হাত কাঁপে না, মড়া পোড়াইতে তাহারও সেইরূপ হাত কাঁপিত না; মৃতের কত অর্দ্ধদগ্ধ মস্তক সে কাঁচা বাঁশের আঘাতে চূর্ণ করিয়াছে! চিতায় অগ্নিসংযোগ কবিয়া সেই চিতাগ্নি তুলিয়া সে অদূরে বসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে গাঁজা টানিয়াছে, তাহার মনের উপর কখনও বিন্দুমাত্র দাগ পড়ে নাই। এই বিষাদময ঘটনা সে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার বলিয়াই মনে করিত।—এক এক সময় তিনু আক্ষেপ করিয়া বলিত, 'আমি এত লোকেব মড়া পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, আমি মরলে আমাকে কেউ ছোঁবেও না। ডোমে পায়ে দড়ি বেঁধে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসবে, শেয়াল-শকুনে ফলার করবে! তা সে মন্দ নয়, পুড়ে মরার চেয়ে ভাল। আমি ত আর দেখ্‌তে আসবো না; তবে ঐ যে ডোমের হাতে ভাগাড়ে যেতে হবে, ঐ যা কিছু দুঃখ। যা থাকে কপালে, এবাব ভেক্ নিয়ে বোষ্টম হব, বোরেগী ভায়ারা সমাজ দেবে। কিন্তু ভেক ত নেব, মচ্ছব দেবার টাকা পাব কোথায়?'—বেচারা কোন দিকে ভাবনা কূল-কিনারা না দেখিয়া পাঁচির কুটীরে বসিযা অত্যন্ত হতাশভাবে গাঁজায় দম দিত।

মৃতদেহ দাহ করিয়া আজও তাহার গঞ্জিকা-পানের জন্য অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় সে অতি কষ্টে

লোভ দমন করিয়া বিশ্বরূপের নিকট আসিল, এবং তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "ভারি 'গেদে' জল নাম্‌লো যে ! পরিবার ত গিয়েছেই, এখানে পড়ে সাত দিন সাত রাত কাঁদ্‌লেও তাকে ফিরে পাবে না ; তবে শুধু-শুধু জলে ভিজে লাভ কি ? চল্ ঐ দিক্‌কার ঘাটে নেমে 'ছ্যান' করে বাড়ী যাই । বেটাছেলে তুমি, তোমার ভাবনাটা কি ? টাকা পয়সা করেছ, একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে কর না কেন ? গোয়াল কি খালি রাখ্‌তে আছে ! চল এখন ; দেবী ভাই শীগ্‌গির চল্ । আঃ, মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়বে না কি ? ওরে বাপ্, দেবতার ডাক কি !"

হঠাৎ দিকমণ্ডল আলোকাকীর্ণ করিয়া দামিনীস্ফুরণ হইল, কড়-কড় মেঘগর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইল । প্রবল বৃষ্টি, তাহার উপর শীতল বায়ুর হিল্লোল ! তাহারা তিনজনে শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কেবল বিদ্যুতালোকের সাহায্যে দূরবর্ত্তী একটি স্নানের ঘাটে গিয়া স্নান করিল ।—মশাল ও লণ্ঠন অনেক পূর্ব্বেই নিবিয়া গিয়াছিল ।

বিশ্বরূপ ভগ্নস্বরে বলিল, "তিনু দা, আমার বুক যে জ্বলে যাচ্ছে !"

তিনু গামছা নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে বলিল, "বাড়ী গিয়ে বুকে একটু সরষের তেল মালিস ক'রো । তুমি ভাই হাসালে দেখ্‌চি ! পরিবার না মরে কার ? কি বলবো, বিয়ে করি নি । বিয়ে করলে তিনকড়ি দশটা পরিবারকে চিলুতে রেখে এসে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো । গাড়োয়ান বেটারা গাছতলায় দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচাচ্ছে ।—এ আঁধারে হেঁটে বাড়ী যাওয়া হবে না, চল গাড়ীতে যাই ।"

যে গাড়ীতে কাঠ আসিয়াছিল সেই গাড়ীর গাড়োয়ান অন্য গাড়োয়ান সহ নদীর পাড়ের উপর একটা সুবৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় গাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল । তিনু দৈবকীনন্দন ও বিশ্বরূপকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়ীর উপর উঠিয়া বসিল । তাহার পর বৃষ্টি একটু থামিলে তাহারা গ্রামে প্রত্যাগমন করিল ।—তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছিল ।

বিশ্বরূপকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া তাহার বৃদ্ধ পিসিমা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার সোনার পিরতিমে কোথায় থুয়ে এলি রে বাবা বিশু !"

বিশ্বরূপ ভিজা কাপড়ে মাটীর উপর 'ধুপ' করিয়া বসিয়া-পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "ঢাকি-সুদ্ধো বিসর্জ্জন দিয়ে এলাম, পিসিমা ! আমি আর এ বাড়ীতে থাক্‌তে পারবো না । আজ থেকে আমার দোকানপাট উঠে গেল ।"

[৪]

পরদিন হইতে বিশ্বরূপের কুটুম্বেরা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গ্রামস্থ এক একজন

মাতব্বর কুটুম্বের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মহা উৎসাহে 'বৈঠক' করিতে লাগিল—বৈঠকের উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু বিশ্বরূপ সমাজচ্যুত তিনকড়ির সাহায্যে তাহার পত্নীর মৃতদেহের সৎকার করিয়াছে, অতএব তাহাকে একঘরে করিয়া রাখা হউক ; তাহার ধোপা নাপিত বারণ, এবং পুরোহিত রামচরণ চক্রবর্ত্তী যদি তাহার দশজন যজমানের অপমান করিয়া কিঞ্চিৎ লাভের আশায় বিশ্বরূপের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিতে যায়,—তাহা হইলে রামচরণকে পুরোহিত পদ হইতে অপসারিত করা হউক। সমাজের বিচারে যে পতিত, তাহার ক্রিয়া-কর্ম্ম করিবে বা দান গ্রহণ করিবে,—এরূপ অনাচারী পুরোহিত তাহাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তির গৃহে পূজার্চ্চনাদি কার্য্য করিবার অধিকারী নহে।

দুই তিনটি বৈঠকে এই একই 'রেজোল্যুসন' পাশ হইল ; বিশ্বরূপও লোকমুখে বৈঠকের কথা শুনিল, কিন্তু সে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।—দোকান বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি বাড়ী বসিয়া পাতানীর জন্য শোক করিতে লাগিল। কুটুম্ব মহাশয়দের ধারণা হইয়াছিল, একঘরে করিবার ভয় দেখাইলেই বিশ্বরূপ তাহাদের দ্বারে দ্বারে মাথা কুটিয়া বেড়াইবে, এবং তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সমাজপতিরা যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই সে নতশিরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু বিশ্বরূপ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিল না ; কি ভাবে স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিবে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না, বা কাহারও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল না।

গ্রামের দশঠাকুর বিশ্বরূপের এবম্প্রকার তূষ্ণীম্ভাব দেখিয়া অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিল ; এবং একদিন সায়ংকালে বঙ্ক হালদারের গৃহে এক বৈঠক বসাইয়া বিশ্বরূপকে সেখানে ডাকিয়া পাঠাইল। দশঠাকুরের হুকুম অগ্রাহ্য করা বিশ্বরূপ বড় সঙ্গত মনে করিল না ; সে মলিন বেশে বিষণ্ণ বদনে সমাগত কুটুম্বগণের মজলিসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুটুম্বদের চাঁই বঙ্ক হালদার হুঁকার নল হইতে মুখ সরাইয়া লইয়া বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখ বিশ্বরূপ, বিশেষ প্রয়োজনে দশঠাকুর এই বৈঠকে তোমাকে তলব দিয়েছেন। তোমার পরিবারটি গতো হওয়ায় আমরা সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত ; কিন্তু তুমি যে আমাদের দশজনকে অবিজ্ঞা করে একঘরে তিনেকে নিয়ে পরিবারের সৎকার করে এসেছ, এ কার্য্যটি তোমার পক্ষে বড়ই গর্হিত হয়েছে। এজন্য দশঠাকুর বৈঠকে বসে এই মত প্রেকাশ করেছেন যে, তোমার মত ভ্রেষ্টাচারীকে নিয়ে আমরা সমাজে চল্‌তে পারি নে।—এ বিষয়ে তোমার কি বল্‌বার আছে বল।"

বিশ্বরূপ গলায় কাপড় দিয়া করযোড়ে বলিল, "আমার অপরাধ কি বলুন ? আমি কুটুম্ব মহাশয়দের দোরে-দোরে ঘুরেছি, কেউ আমার বিপদে একবার টুকি

দিলেন না ; কাউকে 'কাঁধে বাঁশে' যেতে রাজি করতে পারলাম না। মড়া ত আর ঘরের মধ্যে তিন দিন ফেলে রাখতে পারিনে, কাজেই তিনকড়িকে ডেকে কাজ সারতে হলো।"

মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক উক্ত বঙ্ক হালদারের বৈবাহিক, যৌবনকালে তিনি নানা কুকীর্ত্তি করিয়া এখন বৃদ্ধ বয়সে বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইয়াছেন, এবং নামাবলী ও 'কুঁড়োজালি' সম্বল করিয়া পরম নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন। তিনি তাঁহার হরিনামের ঝুলিটি দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া তাহা টিকে স্পর্শ করতঃ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আহা বাজে কথা কেন বলচো, বিশু ? বুঝে-সুজে কথা বলো। তুমি যে 'কাঁধে বাঁশে' যাবার জন্যে দশজনকে ডাকতে গিয়েছিলে, কিন্তু মেতো বের করার পূর্ব্বে প্রাচিত্তির করেছিলে ? আঁতুড়ে মড়া, কি রোগে মরলো তার ঠিক নেই ; প্রাচিত্তির না করলে কুটুম্ব ঠাকুরেরা মড়া ঘাড়ে তুলবে কেন ? এ কি তুমি মুদ্দোফরাস পেয়েছ যে—হুকুম করলে আর সকলে মড়া ঘাড়ে নিয়ে শ্মশানে ছুটলো ?—সকলেরই ত নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ আছে।—প্রাচিত্তির না করে কুটুম্বদের কাছে যাও কেন ?"

বিশ্বরূপ বলিল, "আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলছিল, প্রাচিত্তির-ফ্রাচিত্তিরের কথা আমার মনে হয় নি। তা আমাকে এখন দশঠাকুরে কি করতে বলেন ?"

বঙ্ক হালদার বলিল, "আমি সকলকে বুঝিয়ে কতকটা ঠাণ্ডা করেছি। আজ কালকার নব্য যুবোরা কি সেকেলে বুড়োদের কথা মানতে চায় ?—আমি বলি তোমার মত একজন মাতব্বব কুটুম্ব বিপদে পড়ে যদি একটা অন্যায়-অপন্যায় করেই ফেলে, তবে কি তার প্রিতিকার হবে না ?—চিরকালই সমাজে সে আটক্ থাকবে ?—এ হ'তেই পারে না। কিন্তু এ জন্যে বাপু তোমাকে কিঞ্চিৎ ব্যয়-ভূষণ করতে হবে !"

বিশ্বরূপ অচঞ্চল ভাবে বলিল, "আপনার প্রেস্তাবটা কি বলুন।"

মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক বলিল, "আমার কাছেই শোন।—সাতখান গাঁ নিয়ে আমাদের সমাজ। তোমার পরিবারের ছেরাদ্দ উপলক্ষে এই সাত গাঁয়েব বিলকুল কুটুম্বকে তোমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে আনতে হবে। একটি 'পাকা' ফলার, একটি 'কাঁচা' ফলার (চিঁড়া-দই) আর একটি ভোজ, এই তিনটির ব্যবস্থা যদি করতে পার—তবে তোমাকে নিয়ে আমরা চলতে পারি।"

বিশ্বরূপ বলিল, "আমার তা অসাধ্যি।—একে আমার লোকাভাব, তার উপর আমার সঙ্গতিই বা কোথায় ?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "লোকাভাবে কিছু আসে যায় না, আমরা দশজন এসে সকল কাজের ব্যবস্থা করবো, কোন রকমে তোমার অপযশ হতে দেব না ; তবে যে

বল্‌লে তোমার সঙ্গতি নেই, ও বাজে কথা। তোমার কি আছে না আছে তা ত আমাদের অছাপি নেই।—এ তিনটেই তোমাকে দিতে হচ্ছে।"

বিশ্বরূপ বলিল, "আমাকে দিয়ে তা হয়ে উঠবে না।"

বঙ্ক হালদার বলিল, "আচ্ছা, তিনটে না পার—দুটো দাও ; চুলোয় যাক্ কাঁচা ফলার। মেলেরিয়ার সময় চিঁড়ে-দৈ না হয় না দিলে, কিন্তু নুচির ফলারটা আর ভোজটা—এ দেওয়াই চাই।"

বিশ্বরূপ বলিল, "আমি কিছুই পারব না।—বিপদের সময় যারা একবার টুকি দিয়ে দেখে না, আমি তাদের ভোজ ফলার দিয়ে জাতে উঠ্‌তে চাইনে। আমি না হয় একঘরে হয়ে থাকবো।"

এই কথা শুনিয়া বৈঠকের দুই তিনজন কুটুম্ব একসঙ্গে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, বলিল, "কি, এত বড় কথা ? কুটুম্বের অপমান !—থাক্ ও একঘবে হয়ে। দেখি কোন্ পুরুত ওর বাড়ী শ্রাদ্ধ করে, কোন্ নাপিত ওকে কামায়, কোন্ ধোপা ওর কাপড় কাচে !"

বিশ্বরূপ বলিল, "না হয় গাঁ ছেড়ে যাব, মরার-বাড়া ত আব গাল নেই ! আপনারা দশঠাকুর জুটে যা পারেন, করবেন।"

বিশ্বরূপ আর সেখানে না দাঁড়াইয়া, কোন দিকে না চাহিয়া, বাড়ী ফিরিযা গেল। তখন সেই বৈঠকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—বিশ্বরূপ একঘরে হইয়া থাকিবে। তাহার নাপিত-পুরুত বন্ধ। কুটুম্বের অপমান করে—এত বড় আস্পর্দ্ধা ! ভোজ ফলার দিতে রাজী না হইলে কেহ যেন উহার ছায়াও না মাড়ায়।

[৫]

পুরোহিত ও ধোপা-নাপিত বন্ধ হওয়ায় বিশ্বরূপ অতঃপর গ্রামে বাস করিতে সাহস করিল না। শ্রাদ্ধের দুই তিন দিন পূর্ব্বে সে তাহার পিসিকে লইয়া, নন্দীগ্রামের পৈত্রিক ভিটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাসুদেবপুরে ভগিনীর গৃহে চলিল।

গঙ্গামণি যথাসময়ে ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাড়ীতে দুর্গোৎসব বলিয়া তিনি ভ্রাতার দুঃসময়ে তাহার গৃহে যাইতে পারেন নাই। পূজার আর বিলম্ব ছিল না, তাঁহাকেই সকল উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল।—তিনি দীর্ঘকাল পরে ছোট ভাইটিকে গৃহে স্থান দিলেন, পিসিমারও যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন।

শ্যালকের প্রতি নন্দীগ্রামের কুটুম্বদের দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া নিতাই পাল

বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন ; বিশ্বরূপকে বলিলেন, "তোর আর সে গাঁয়ে গিয়ে কাজ নেই, দোকান-পাট বিক্রি করে আমার এখানেই থাক, তোকে একখানি ছোট-খাট আড়ত খুলে দেব। পুজোটা তো বেরিয়ে যাক, দেখে-শুনে তখন একটা বিয়েও দিয়ে দেব।"

নিতাই ধনাঢ্য মহাজন ; তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করায় বিশ্বরূপের পত্নীর শ্রাদ্ধ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইল। তাহাকে কিছুই ব্যয় করিতে হইল না। নন্দীগ্রামের কুটুম্বদের ভোজ ফলার মাঠে মারা গেল! ইহাতে দুই চারিজন 'ফলারে' কুটুম্ব তাহাদের সমাজের চাঁই মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক ও বঙ্ক হালদারের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "ওরা বেশী লোভ করতে গিয়েই সকল দিক খোয়াল ; একটা পাকা ফলারের দাবী করিলেই চলত ; তা নয়, দুটো ফলার—একটা ভোজ! বেচারা পেরে উঠবে কি না তাও ত দেখতে হয়।"—কিন্তু তাহাদের এই আক্ষেপে কোন ফল হইল না।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। নিতাই পাল একবার দেড় টাকা মণ ছোলা কিনিয়া সাড়ে তিন টাকা মণ দরে সমস্ত ছোলা বিক্রয় করিয়া ত্রিশ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। সেইবার তিনি আট হাজার টাকা ব্যয়ে এক চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া মহা সমারোহে দশভূজার পূজা করেন ; সেই বৎসর হইতে মহামায়া অত্যন্ত ঘটা করিয়া নিতাইয়ের বাড়ী প্রতি বৎসরেই পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

এবারও নিতাইয়ের বাড়ী সমারোহের অন্ত নাই। মা দুর্গার আপাদমস্তক সোনালী সাজে ভূষিত। মণ্ডপের বাহার দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। নিকটস্থ কোন গ্রামে দুর্গোৎসব হয় না, তাই আশ-পাশের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু পল্লীবাসী নূতন বস্ত্র পরিয়া পালেদের বাড়ী পূজা দেখিতে আসিল। গ্রামের ছেলেরা মিঠাই মণ্ডা লইয়া ভাঁটা খেলিতে লাগিল। নিতাই পাল তাঁহার আড়ত হইতে দশ টিন ঘি ও ছয় বস্তা ময়দা পূজার খরচের জন্য বাহির করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা হইতে পাঁচজন হালুইকর আসিয়া ভিয়ান আরম্ভ করিয়াছে। ষষ্ঠীর দিন প্রভাতে স্বরূপপুরের মুচিরা দশটা পাখাওয়ালা ঢাক আনিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঢাকের বাদ্যে গ্রাম তোলপাড়। কলিকাতা হইতে "বৌকুণ্ডু"র যাত্রার দল আসিয়াছে—তিন রাত্রি গাহনা হইবে। আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনার সীমা নাই।

তিন দিন আমোদ-প্রমোদে কাটিয়া গেল, কিন্তু বিশ্বরূপ কোনও আমোদে যোগদান করিল না। সে মণ্ডপের এক পাশে দিবারাত্রি বসিয়া থাকিত, কি ভাবিত তা সে-ই জানে। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় গঙ্গামণিও এ কয়দিন ভ্রাতার

কোন তত্ত্ব লইতে পারেন নাই।

দশমীর দিন অপরাহ্নের বরণের পর দেবী প্রতিমাকে বেদী হইতে নামাইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ভাগীরথী তীরে লইয়া যাওয়া হইল। ঢাক, ঢোল, সানাই, জগঝম্প, চড়বড়ে প্রভৃতির বাদ্যোদ্যমে জলস্থল প্রকম্পিত হইতে লাগিল।—প্রতিমা নৌকায় তুলিয়া 'বাচখেলা' আরম্ভ হইল। অসংখ্য বালক বৃদ্ধ যুবক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলে-ডিঙ্গিতে উঠিয়া ভাগীরথী-বক্ষ আলোড়ন পূর্ব্বক জলবিহার করিতে লাগিল। কোন কোন দল ডুগি-তবলা লইয়া নৌকায় উঠিয়াছে, কোন দল বাউল সাজিয়া নৌকায় বসিয়া 'দেহতত্ত্বের' গান করিতেছে। ভাগীরথীর উভয় তীরে—ভাগীরথীর সুপ্রশস্ত বক্ষে নরমুণ্ডের স্রোত চলিতেছে!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। দশমীর শশধরের শুভ্র রশ্মিজাল ক্রমে শুভ্রতর হইল; জলস্থল অন্তরীক্ষ জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত হইল। নদীবক্ষে তখনও আনন্দোৎসবের পূর্ণ উচ্ছ্বাস। প্রতিমার নৌকায় কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার সম্মুখে চারিটা মশাল দপ্‌-দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিমার হরিতালরঞ্জিত প্রশান্ত বদনমণ্ডল সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ভক্তগণের হৃদয়ে মহিমামণ্ডিত মাতৃভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। একদল যুবক একখানি সুদীর্ঘ জেলে-ডিঙ্গীর দুই পাশে সারি দিয়া বসিয়া সবেগে দাঁড় টানিতে-টানিতে প্রতিমার নৌকার সম্মুখ দিয়া নদীজল আলোড়ন করিয়া চলিয়া গেল।—মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা দাঁড় তুলিয়া একবাব প্রতিমার আলোকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর দাঁড় টানিতে টানিতে গায়িতে লাগিল,—

"সোনাব কমল কে ভাসালে জলে?
মা বুঝি কৈলাসে চলেছে!"

নদীবক্ষে যখন এইরূপ উৎসব চলিতেছিল, তখন পালেদের সুবিস্তীর্ণ চণ্ডীপমণ্ডপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! একটা সুদীর্ঘ পিল্‌সুজে একটা ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিয়া-জ্বলিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল; সেই মৃদু আলোকে সেই অট্টালিকার অন্ধকার যেন কি অব্যক্ত বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছিল। পূজামণ্ডপ তখন জনশূন্য! কেবল বিশ্বরূপ দেবীর শূন্য বেদীর অদূরে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছিল।

তাহার পর বিশ্বরূপ কখন্ সেখান হইতে উঠিয়া কোথায় যে চলিয়া গেল, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল; শরচ্চন্দ্রের শুভ্র আলোকরাশি স্ফুটতর হইয়া যেন আনন্দের প্লাবনে চবাচব ভাসাইতে লাগিল।

গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণ-রোপিত ও অযত্নবর্দ্ধিত রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে মৃদুগন্ধ উত্থিত হইয়া এবং শেফালিকার মিষ্ট গন্ধের সহিত মিশিয়া বায়ুপ্রবাহে চতুর্দ্দিক সৌরভাকুল করিয়া তুলিল। গৃহে গৃহে তখন প্রণামাশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গনের তরঙ্গ বহিতেছিল। গ্রামের পথে-পথে অপূর্ব্ব জনসমাবেশ। কিন্তু নদীতীর তখন নির্জ্জন, উৎসবের কোনও চিহ্ন সেখানে নাই। প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষ রজতধবল চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত, তীরে তরীগুলি বাঁধা,—কোন নৌকায় জনমানবের সমাগম নাই। নদীতীরে একজোড়া ঝাউগাছ নৈশবায়ু প্রবাহে সন্-সন্ শব্দ করিতেছে ; আমগাছের শাখায়-শাখায় অন্ধকার জ্যোৎস্নার ভয়ে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আছে , দুই একটা বাদুড় নিঃশব্দে উড়িয়া আসিয়া ঝুপ্-ঝাপ্ করিয়া দেবদারু গাছে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এমন সময় নদীতীরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে করুণ স্বরে গাহিয়া উঠিল,—

"মা, মা ব'লে আর ডাক্‌বো না,
তারা দিয়েছ, দিতেছ কত যন্ত্রণা !
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী !
দেশান্তরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
তারা ব'লে আর ডাক্‌বো না।"

ইহার পর আর কেহ বিশ্বরূপকে সে অঞ্চলে দেখিতে পায় নাই।

নবম স্তবক

বিজয়ার মিলন

[১]

"কাকা, ও-জমিটুকু আমাকে ছাড়িয়া না দিলে আমার বড়ই অসুবিধা হইবে ; আমার ঘরের পাশের জমি, ও-টুকু আপনার বিশেষ কোন কাজে লাগিবে না, কিন্তু উহা না পাইলে আমার এ বাড়ীতে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।"

কাকা বলিলেন, "কিছুতেই যে তোমার পেট ভরে না দেখিতেছি ! ষোল আনা সম্পত্তির দশ আনা তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া আমি পাঁচ জনের অনুরোধে ছয় আনা মাত্র লইলাম, ইহাও তোমার সহ্য হইতেছে না ? ও-জমি আমার ভাগে পড়িয়াছে, উহা তোমাকে দিতে পারিব না ; সরকারী পায়খানাটি তোমার ভাগে পড়িয়াছে, আমার একটা পায়খানা না করিলে চলিবে না ; আমি ওখানে পায়খানা করিব !"

ভাইপো বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে আমাকে যে পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করিতে হয় ! আমার রান্নাঘরের পাশে আপনি পায়খানা করিলে আমি কি করিয়া এ বাড়ীতে বাস করি ?"

কাকা বলিলেন, "বাস করিতে না পার উঠিয়া যাও।"

খুড়া-ভাইপোতে ইহার পর আর কোন কথা হইল না।

দরবেশপুরের মজুমদারেরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। হরিশ্চন্দ্র ও মুকুন্দচন্দ্র উভয়ে সহোদর ভ্রাতা। তাঁহাদের পৈত্রিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না, কিন্তু জ্যেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র শুভক্ষণে সাহেব-জমীদারের ডিহী সনাতনপুরের নায়েবী-পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন ; সেই অর্থে তিনি পৈত্রিক খড়ো বাড়ী ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড পাকা-ইমারত প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; বাগান পুকুর ও জমীজমাও প্রচুর করিয়াছিলেন। জমীদারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি সর্ব্বদা বাড়ী আসিতে পারিতেন না, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দচন্দ্রের উপর সংসারের কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

মুকুন্দচন্দ্র বাড়ী বসিয়া গ্রাম্য সাব-রেজেষ্ট্রারী আফিসে কুড়ি টাকা বেতনের কেরাণীগিরি করিতেন। কুড়ি টাকা বেতনে একালে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন ; কিন্তু দাদার উপার্জ্জিত অর্থেই সংসার চলিত, তাঁহার কুড়ি টাকার কুড়ি পয়সাও খরচ হইত না, বরং দাদার প্রেরিত সংসার-খরচের টাকা হইতেও কিছু-কিছু সঞ্চিত হইত ; তাহা ডাকঘরের 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে' জমিত। সেভিংস

ব্যাঙ্কের দুই খানি খাতার একখানি খাতা মুকুন্দের স্ত্রী মুক্তকেশীর নামে ; অন্য খানি পুত্র মুরারীমোহনের নামে। এতদ্ভিন্ন মুক্তকেশী গহনাপত্র বন্ধক রাখিয়া পল্লীবাসিনীগণকে মাসিক অর্দ্ধ আনা সুদে নিত্য টাকা ধার দিতেন। কয়েক বৎসরের মহাজনীতে সুদের টাকা আসল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস ছিল মজুমদারের ছোট গিন্নীর হাতে যে টাকা আছে তাহাতে তালুক-মুলুক কিনিতে পারা যায়!

গ্রামের লোক যাহা জানিত, বড় গিন্নী অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী তাহা যে না জানিতেন এমন নয়, কিন্তু জানিয়া-শুনিয়াও অগত্যা তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত, পরম শত্রুতেও হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রৈণ অপবাদ দিতে পারিত না। মাতঙ্গিনী দেবরের কপট ব্যবহারের কথা অনেকবার স্বামীর গোচর করিয়াছিলেন, অভিমান, অশ্রুবর্ষণ, ভূমিশয্যাগ্রহণ, বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবার ভয় প্রদর্শন, প্রভৃতি সাংঘাতিক অস্ত্রে স্বামীর মর্ম্মভেদ করিবার চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই ; কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের ভ্রাতৃবাৎসল্যের সুদৃঢ় বর্ম্মে তাহা সকলই চূর্ণ হইয়াছিল। 'সদাশিব' হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীর অভিযোগে কোন দিন কর্ণপাত করেন নাই ; 'ঘ্যানঘ্যানানি' নিতান্ত অসহ্য হইলে তিনি বলিতেন, "তোমার কথা শুনিয়া কি আমার ছোট ভাইটিকে পৃথক করিয়া দিব ? তাহা হইলে গ্রামের লোকের কাছে মুখ দেখাইব কি করিয়া ? এ সকল কথা আর মুখে আনিও না।"—স্বামীর অন্ধত্ব দূর করিবার আশা নাই বুঝিয়া মাতঙ্গিনী হতাশ ভাবে অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক মনের জ্বালা নিবারণ করিতেন। সুতরাং সংসারে সুখের অভাব না থাকিলেও শান্তি ছিল না।

মুকুন্দ খুব সাংসারিক লোক, তাঁহার বাহ্যিক সরলতা আন্তরিক কুটিলতার নির্ভরদণ্ডস্বরূপ ছিল। তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখিতেছিলেন, দাদা তাঁহাকে যতই স্নেহ করুন, বিশ্বাস করুন, তাসের সুন্দর প্রাসাদ একদিন চূর্ণ হইবেই, একদিন তাঁহাকে পৃথক হইতেই হইবে ; সুতরাং তিনি সাধ্যানুসারে বেশ 'গুছাইয়া' লইতেছিলেন : কিন্তু দাদা যাহাতে মনে কষ্ট পান বা বিরক্ত হন, প্রকাশ্যে তিনি এরূপ কোন কার্য্য করিতেন না ; দাদার প্রতি মুকুন্দ ইষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি প্রকাশ করিতেন। নিজের পুত্রের জন্য বিলাতী কাপড় কিনিতেন, কিন্তু ভাইপো হারাণের জন্য মিহি ফরাসডাঙ্গার ধুতি ভিন্ন অন্য কাপড় কিনিতেন না। হরিশ্চন্দ্রও জানিতেন, সংসারে তাঁহার ভাই ভিন্ন অধিক আপনার জন আর কেহই নাই ; মুকুন্দের সঙ্গেই তাঁহার সকল বৈষয়িক পরামর্শ হইত। তিনি সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ভ্রাতার নিকট প্রচুর অর্থ পাঠাইতেন, কিন্তু 'ভাই কি মনে করিবে' ভাবিয়া কোনদিন জমাখরচ চাহেন নাই ; বরং মুকুন্দ নিষ্কলঙ্ক থাকিবার

জন্য জমাখরচ দেখাইতে আসিলে তিনি বলিতেন, "মুকুন্দ, তুমি কি আমার পর যে, গোমস্তা মুহুরীর মত তোমার কাছে খরচের হিসাব লইব ?"—মুকুন্দ বলিতেন, "না দাদা, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিতে পারে, : আপনার কান ভারি করিতে পারে, হিসাব পত্র দেখাই ভাল ।"—হরিশ্চন্দ্র বলিতেন, "আমি কি স্ত্রীলোক যে, পরের কথায় নাচিব ? তোমাকে অবিশ্বাস করিলে সংসারে আর কাহাকে বিশ্বাস করিব ? বিশেষতঃ তুমি ও তোমার স্ত্রী-পুত্র আমার অবশ্য প্রতিপাল্য ; তোমরা আমার খাইবে না ত কোন্ পরের খাইতে যাইবে?"

এ সকল কথা হরিশ্চন্দ্রের বন্ধুগণেরও অবিদিত ছিল না ; তাঁহারা তাঁহার সদাশয়তায় মুগ্ধ হইতেন বটে, কিন্তু গোপনে বলাবলি করিতেন, "ভায়া একটা পরগণার নায়েবী করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার একেবারেই বৈষয়িক জ্ঞান নাই ; কলিকালে এমন সংসার-জ্ঞানবর্জ্জিত লোক প্রায় দেখা যায় না ! দায়ে না ঠেকিলে হরিশের শিক্ষা হইবে না ।"

[২]

বলা বাহুল্য, হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গ বাড়ীতেই থাকিত । আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমাদের পল্লীঅঞ্চলের লোক এ কালের মত সভ্য বা 'সহর-ঘেঁসা' হয় নাই ; বাড়ীর দরজায় তালা দিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া বিদেশে চাকরী করিতে যাওয়া পল্লীবাসীরা তখন নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিশ্চন্দ্র সনাতনপুরের কাছারীতে নায়েবী করিতেন ; সনাতনপুর তাঁহার বাসগ্রাম দরবেশপুরের দশ ক্রোশ উত্তরে ; সনাতনপুরের কাছারীবাড়ীতে একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও পরিচারক লইয়া তিনি বাস করিতেন ; ইহাতে যে তাঁহার ব্যয়-সংক্ষেপ হইত এরূপ নহে, তাঁহার বাসায় দু' বেলা বিশখানি পাতা পড়িত ; অল্প বেতনের কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহার অন্নেই প্রতিপালিত হইত । এতদ্ভিন্ন উমেদার, ভিক্ষুক, অতিথি অভ্যাগত ভদ্রলোক যে কত আসিত, তাহার সংখ্যা নাই । কেহ তাঁহার ব্যয়বাহুল্যের উল্লেখ করিলে তিনি বলিতেন, "মা অন্নপূর্ণা উহাদিগকে দু'বেলা দুটি খাইতে দিতেছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র ।"

সরকারী কার্য্যোপলক্ষে হরিশ্চন্দ্রকে প্রায়ই মফস্বলে যাইতে হইত বলিয়া কাছারীবাড়িতে তাঁহার জন্য সর্ব্বদা পাল্কী-বেহারা মোতায়েন থাকিত । পূজাপার্ব্বণে তিনি সেই পাল্কীতে বাড়ী আসিতেন ! বারোটা দুলে বেহারা যখন হরিশ্চন্দ্রের পাল্কী লইয়া উড়িয়া আসিত, তখন পথপ্রান্তবর্ত্তী দশখানা গ্রামের

লোক বেহারাদের ঐকাতানিক ভৈরব হুঙ্কার শুনিয়া বুঝিতে পারিত, নায়েব মশায় ডিহীর কাছারী হইতে বাড়ী যাইতেছেন ! বেহারাদের সেই হুঙ্কার নৈশ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যখন গ্রামবাসিগণের কর্ণে প্রবেশ করিত, তখন গ্রামের আড্ডাধারীরা হুঁকার নল হইতে মুখ তুলিয়া বলিত, "হরিশ মজুমদার কি দাপটেই নায়েবী করচে ! বাপ্, বছরে দেড়টা সদরালার সমান পয়সা রোজগার করে !"

দাদা বাড়ী আসিলে মুকুন্দ মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কি করিয়া যে তাঁহার মনোরঞ্জন করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন না। দধি দুগ্ধ মৎস্য তরকারী প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য এমন ছুটাছুটি করিতেন যে, সময়মত আফিসে উপস্থিত হইতে পারিতেন না, এবং সাব্-রেজিষ্ট্রার মৌলবী ইলাহিবক্স মিঞার নিকট গালাগালি খাইতেন।

হরিশ্চন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র গ্রামের স্কুল হইতে ক্রমান্বয়ে তিনবার এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া প্রবেশিকা-জলধি উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই ; সে মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া গ্রামের 'এমেচিয়োর থিয়েটার পার্টি'র দলপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার একটি পুত্র ছিল—তাহার নাম মাণিক, মাণিকের বয়স চারি বৎসর।

মাণিক মুকুন্দের একান্ত অনুগত ছিল, মুকুন্দও তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন ; সে স্নেহে কৃত্রিমতা ছিল না। মুকুন্দের ন্যায় কূটবুদ্ধি বৈষয়িক লোক কেন যে এইপ্রকার দুর্ব্বলতার অধীন হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মনুষ্য-হৃদয় দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন ! আফিসের কাজ শেষ করিয়া অপরাহ্নে মুকুন্দ গৃহপ্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবামাত্র মাণিক "ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদা" বলিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইত, এবং তাঁহার কোলে উঠিতে না পারিলে তাহার ব্যাকুলতা দূর হইত না। সে সময় অন্য কেহ তাহাকে কোলে লইতে আসিলে সে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিত। ঠাকুরদাদার কোলে উঠিয়া সে দুই হাতে তাঁহার কাঁচা-পাকা গোঁফ লইয়া খেলা করিত, এবং নানা আব্দারে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। নিজের পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতার পৌত্রের প্রতি তাঁহার প্রাণের টান দেখিয়া মুক্তকেশী এক একদিন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন, কিন্তু সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের নামে, ইহা স্মরণ করিয়া সাধ্বী অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিতেন।

ঠাকুরদাদার কোলে মাণিক ক্রমে বাড়িতে লাগিল। হারাণ পুত্রকে তেমন আদর করিত না, দিবসের অধিকাংশ সময় বাহিরে-বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইত ; পিতামহের সহিতও মাণিকের বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাণিক বুঝিল, ঠাকুরদাদার মত আর কেহ তাহাকে ভালবাসে না।

ঠাকুরদাদাকে না দেখিতে পাইলে সে চারিদিক অন্ধকার দেখিত, এবং রাত্রে তাঁহার নিকট না শুইলে তাহার ঘুম আসিত না।

[৩]

সংসারে সুখ চিরস্থায়ী নহে ; দিবসের পর রাত্রির ন্যায়, সুখের পর দুঃখ সংসারে অনতিক্রমণীয়। ইহা বিধাতাব অমোঘ বিধান। বিধাতার নির্ব্বন্ধে কিছুদিনের পবে দরবেশপুরের মজুমদার পবিবারে দুঃখের কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিল। নায়েব হরিশ্চন্দ্র মজুমদার দুশ্চিকিৎস্য বাতরোগে পঙ্গু হইয়া জীবনের সন্ধ্যা সমাগমের বহুপূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

হবিশ্চন্দ্র অমিতব্যয়ী ছিলেন। সঞ্চয় আয়ের বাহুল্যে নহে, ব্যয়েব সঙ্কোচে ; তিনি কোন দিন ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে শেখেন নাই, তাই মৃত্যুকালে নগদ টাকাকড়ি বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যে কিছু নগদ টাকা ছিল, মহা সমারোহে তাঁহাব শ্রাদ্ধ কবিতেই তাহা নিঃশেষিত হইল। তাঁহার আত্মার সদগতির জন্য তিন দল কীর্ত্তনওয়ালা মৃদঙ্গধ্বনিতে ক্ষুদ্র দরবেশপুর গ্রামখানি মুখরিত করিয়া তুলিল।

পিতার মৃত্যুব পর হারাণচন্দ্র পিতার চাকরীটি পাইবার জন্য সাহেব সরকারে উমেদারী করিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ম্যানেজার সাহেব তাহাকে জানাইলেন, তাহার ন্যায় জমিদারী-কার্য্যে অনভিজ্ঞ তরুণ বয়স্ক যুবক দায়িত্বপূর্ণ নায়েবী পদ প্রথমেই পাইতে পারে না ; তিনি তাহাকে পেস্কারের পদে নিযুক্ত কবিতে পারেন, ক্রমে জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিলে ভবিষ্যতে সে নায়েবী পাইতে পারে।

নায়েবেব পুত্র নায়েবীর পরিবর্ত্তে পেস্কারী লইতে সম্মত হইল না, কারণ এই পদেব বেতন তেমন অধিক নহে, তাহার উপর তাহাতে কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না ; বিশেষতঃ সর্ব্বদা সাহেবের নিকট থাকা তেমন প্রার্থনীয়ও নহে। এই সকল ভাবিয়া হারাণচন্দ্র হতাশ মনে বাড়ী আসিয়া গৃহিণীর অঞ্চলচ্ছায়ার আশ্রয় লইল।

অতঃপর পিতৃব্য মুকুন্দচন্দ্রের পক্ষে মাসিক কুড়ি টাকা আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিল ; তিনি দুই একবার হারাণকে সাহেবদের পেস্কারীটা লইবার জন্য অনুরোধ কবিলেন, কিন্তু হারাণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না : সে বলিল, পঁচিশটাকার কেরাণীগিরি কবিবার জন্য সে বিদেশে গিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিবে না, তাহাতে জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না!

মুক্তকেশী দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর উপার্জ্জিত টাকাগুলি আর সেভিংস্ ব্যাঙ্কের খাতায় প্রবেশ করিতে পারে না, সংসার খরচেই সকল ফুরাইয়া যায় ! তাঁহার চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইল। অবশেষে তিনি আর অসন্তোষ গোপন করিতে পারিলেন না, ঘাটে-পথে পল্লীবাসিনীগণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ দেখি হারাণের আক্কেলখানা। টাকা পয়সা রোজগার করবার 'ক্ষ্যামতা' নেই, সাত গুষ্টিতে মিলে গিল্‌বে ! আমাদের উনি মাসে কুড়ি টাকা মাইনে পান, সংসারে রাজ্যের কুপুষ্যি, বুড়ো মানুষ ভেবে-ভেবে আধখানা হয়ে গিয়েছেন !"

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর দুই মাস পরে মুকুন্দ হাল ছাড়িয়া দিলেন, হারাণকে বলিলেন, "আমি যতদিন পারিলাম, আমার সামান্য আয়ে সংসার চালাইলাম ; এত বড় সংসার প্রতিপালন করা আর আমার অসাধ্য। তুমি ত চাকরী-বাকরী কিছুই করিবে না ! তুমি নিজের সংসারের ভার নিজে লও ; আমাদের যে কিঞ্চিৎ জমী-জমা আছে পাঁচজনকে ডাকিয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লও !"

হারাণ বলিল, "বাবা এতকাল আপনাদের পুষিলেন, আর তিনি মরিতে-না-মরিতে আপনি আমাকে পৃথক করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন ! উত্তম, আমি পৃথকই হইব ; কিন্তু বাবা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন আমি আপনাকে তাহার অংশ দিব না। ভদ্রাসন বলুন, বাগান বলুন, জোতজমা, পুষ্করিণী, সকলই বাবার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ; এ সকল তাঁহার উপার্জ্জনের টাকায় হইয়াছে, আপনি কোন্ হিসাবে তাহার অংশ চান ? 'ঘোল খাবে হরিদাস, আর মাধাই দেবে কড়ি' ?"

বৃদ্ধ পিতৃব্যের সহিত এরূপ উদ্ধত আলাপ শিষ্টাচারসঙ্গত নহে, কিন্তু সামাজিক শিষ্টাচারের সহিত হারাণের পরিচয় ছিল না ; সে মনে করিত, পিতার গলগ্রহ গ্রাম্য সাবরেজেষ্ট্রী আফিসের বিশ টাকা মূল্যের কেরাণী তাহার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের দাবী করিতে পারে না !

মুকুন্দ ভ্রাতুষ্পুত্রের কটূক্তিতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "আমি যে আজ এই বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া চাকরী করিতেছি, আমি কি সংসারের জন্য কিছুই ব্যয় করি নাই ? তোমার বাবা বিদেশে চাকরী করিতেন, মধ্যে মধ্যে পাল্‌কী হাঁকাইয়া বাড়ী আসিতেন আর আমার উপর হুকুম চালাইতেন ! আমি চাকরের মত তাঁর হুকুমে খাটিয়াছি, টাকার অনটন হইলে নিজের টাকা দিয়া সংসার চালাইয়াছি।—বাড়ীতে একটা গোমস্তা মুহুরী রাখিলে তাহাকে শালিয়ানা কত টাকা দিতে হয় ?"

হারাণ বলিল, "বাবা মরিয়াছেন তাই আজ আপনি নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছেন ! আমার পিতার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে আপনার কোন অধিকার নাই, আমি সমস্ত

দখল করিব ; আপনার ইচ্ছা হয় আপনি (partition Suit) 'পার্টিশন সুট' করিতে পারেন।"

মুকুন্দ বলিলেন, "আমি তোমাকে কোলে-পিঠে লইয়া মানুষ করিয়াছিলাম, তুমি তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে বসিয়াছ ! কলির ধর্ম্ম কি না ?"

হারাণ বলিল, "আপনি আমাকে একটু স্নেহ করিতেন এই হেতুবাদে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিতে চান ?—চমৎকার যুক্তি বটে ! এমন স্নেহ প্রকাশের কোনও আবশ্যক ছিল না। আপনি বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন—সে সমস্ত টাকাই জমাইয়াছেন ; কাকী-মা শুনিয়াছি—আট দশ হাজার টাকা লইয়া মহাজনী করিতেছেন ; আমি কি সে টাকার ভাগ চাহিতেছি, না ভাগ চাহিলেই তা দিবেন ? কুড়ি টাকার চাকরী করিয়া আজকাল সংসার প্রতিপালন করা যায় না ; কাকী-মা কি বাপের বাড়ী হইতে টাকা আনিয়াছিলেন ?"

"তোমার মত অকৃতজ্ঞের আর মুখ দর্শন করিব না"—বলিয়া মুকুন্দচন্দ্র সক্রোধে তামাক টানিতে লাগিলেন।

[৪]

মহা সমারোহে একটা প্রকাণ্ড বাঁটোয়ারার মামলার আয়োজন চলিতে লাগিল। গ্রামে হরিশ্চন্দ্রের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর অভাব ছিল না। তাঁহারা মজুমদারদের গৃহ-বিবাদ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুকুন্দকে বুঝাইয়া বলিলেন. "তোমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই তোমার দাদার উপার্জ্জিত. এ কথা আমরা সকলেই জানি ; ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে হয়, কিন্তু তোমরা দুই ভাই চিরদিন একান্নে ছিলে. যাহা কিছু আছে তাহার দশ আনা অংশ হারাণকে ছাড়িয়া দাও।"—তাঁহারা হারাণকে বলিলেন, "সম্পত্তি তোমার পিতার স্বোপার্জ্জিত তাহা আমরা জানি ; কিন্তু তোমার বাবা ও কাকা বরাবর একান্নে ছিলেন, মুকুন্দও দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন. তোমাদের সংসারের উন্নতির জন্য ভূতের মত খাটিয়াছেন, তাঁহাকে একেবারে বঞ্চিত করিলে বড় অন্যায় হইবে। যদি তোমার কাকা মামলা করেন, তাহা হইলে অর্দ্ধেক সম্পত্তি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে। অনর্থক কতকগুলা টাকা মামলায় নষ্ট করিবে কেন ? আমরা তোমার কাকাকে বলিয়াছি তিনি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দশ আনা অংশ তোমাকে দিবেন, তিনি ছয় আনা

পাইবেন। বাঁটোয়ারার মামলা হাতীর খোরাক, মামলা করিলে শেষে তোমাদের দু'জনকেই পথে দাঁড়াইতে হইবে।"

গ্রামের বৃদ্ধ রায় মহাশয়কে হরিশ্চন্দ্র মুরুব্বী মনে করিতেন, কখনও তাঁহার কথার অন্যথাচরণ করিতেন না, হারাণ তাহা জানিত ; সে তাঁহার সৎপরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। মধ্যস্থগণের আপোষে সমস্ত সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া গেল ; কিন্তু ঘরের পাশের তিন কাঠা জমি লইয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিরোধ রহিয়া গেল। এই তিন কাঠা জমি কাকার ভাগে পড়িয়াছিল ; কিন্তু তাহা না পাইলে হারাণের অত্যন্ত অসুবিধা হয়, সেইজন্য তাহা ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত হারাণ কাকাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, পাঠক গল্পারম্ভে তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

হারাণ পাছে জোর করিয়া জমিটুকু দখল করে এই ভয়ে মুকুন্দ সেই রাত্রেই মজুর দিয়া জমিটুকু ঘিরিয়া লইলেন, এবং তাহাতে কতকগুলি সরিষা ছড়াইয়া প্রবেশদ্বারে তালা-চাবি লাগাইলেন।

হারাণ বলিল, "উনি ভিটায় সরষে বুনিলেন, আমি ঘুঘু না চরাইয়া ছাড়িব না।"—সেই দিন হইতে খুড়া-ভাইপোতে মুখ দর্শন বন্ধ হইল ; বলা বাহুল্য, হাঁড়ি পূর্ব্বেই পৃথক হইয়াছিল।—এবার কথা পর্য্যন্ত বন্ধ হইল !

[৫]

কিন্তু এক বাড়ীতে বাস করিয়া এ ভাবে কালযাপন করা বড় কষ্টকর। তথাপি উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু সংসারে অশান্তির সীমা রহিল না ; এই তিন কাঠা জমি খুড়ো-ভাইপোর মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া বিধাতার অভিশাপের মত পড়িয়া রহিল ; এবং সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া উভয় শরিকে তুমুল কলহের উৎপত্তি হইতে লাগিল। মা লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন।

মুকুন্দ ও হারাণ উভয়েই পরস্পরকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু জমিটুকুর লোভ ছাড়িয়া শান্তিলাভ করা কাহারও সঙ্গত মনে হইল না। সকল অপেক্ষা বিপন্ন মাণিকের ! ঠাকুরদাদার কোলটি হঠাৎ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় সে মনে বড় বেদনা পাইল ; ইহাই সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করিতে লাগিল। কিন্তু যে ক্রোড়ে সে আজন্ম বৰ্দ্ধিত হইয়াছে—সহজে তাহার লোভ ছাড়িতে পারিল না ; তিন কাঠা বিবাদী জমি অপেক্ষা তাহার মূল্য তাহার নিকট

অনেক অধিক ।

একদিন অপরাহ্নে হারাণ ভ্রমণে বাহির হইবে, এমন সময় সে দেখিতে পাইল মাণিক ধীরে ধীবে নামিয়া তাহার ঠাকুরদাদার ঘরের দিকে যাইতেছে ।—অদূরে পিতাকে দেখিয়া মাণিক ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল ।

হারাণ জিজ্ঞাসা করিল, "মাণ্‌কে, কোথায় যাচ্ছিস্ রে ?"

মাণিকের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, সে তখনও মিথ্যা কথা বলিতে শেখে নাই, ভয়ে ভয়ে বলিল, "ঠাকুরদাদার কাছে ।"

হারাণ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আর ঠাকুরদাদার কাছে যেতে হবে না । ঠাকুরদাদা বড্ড ভালবাসে ! ফের যদি ওমুখো হবি ত জুতিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব ।"

হারাণের কঠোর কথাগুলি মুকুন্দের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি তখন ঘরে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন । মুক্ত বাতায়ন-পথে তিনি দেখিতে পাইলেন মাণিক তাঁহার নিকট যাইতে-যাইতে পিতার তিরস্কারে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কাতর ভাবে ফিরিয়া গেল । তিনি হৃদয়ে বড় বেদনা পাইলেন ।

মুকুন্দ মাণিককে তাহার ছয় মাস বয়সের সময় হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন । মাণিক বিশ্বসংসারে ঠাকুরদাদাকেই একমাত্র বন্ধু জানিত, তাঁহার উপর নানা দৌরাত্ম্য করিত ; ঠাকুরদাদা যত আবদার সহ্য করিতেন, তাহার পিতামাতাও তাহার তত আব্দার অত্যাচার সহিত না । সেই ঠাকুরদাদার সঙ্গে মাণিকের একবার দেখা করিবারও উপায় নাই !—মাণিক ঘরে আসিয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল ।

ঠাকুরদাদা ভাগবত বন্ধ করিয়া বসিয়া-বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন । তাঁহার চক্ষু দুটি অশ্রুভারে ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল । মাণিককে দিনান্তে একবার কোলে না লইলে তাঁহার মন স্থির হইত না ; তাঁহার কাজ কর্ম্ম ভাল লাগিত না । কিন্তু মাণিককে আর কোলে লইবার উপায় নাই ; তাহার কচি মুখের মিষ্ট কথাও আর শুনিতে পান না ।—মুকুন্দের বুকের উপর একটা গুরুতর পাষাণভার চাপিয়া রহিল ।

[৬]

এই ভাবে কয়েকমাস কাটিয়া গেল । পূজা আসিল । মুকুন্দ প্রতিবৎসর পূজার সময় মাণিকের জন্য ভাল জুতা জামা কাপড় কিনিতেন । এবার কিনিবেন কি না ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । ষষ্ঠীর দিন তিনি পরিবারবর্গেব জন্য নব

বস্ত্রাদি কিনিয়া আনিলেন। একটি ভৃত্য কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া আসিতেছিল, মাণিক তখন একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া নিতান্ত বিষণ্ণভাবে পথে দাঁড়াইয়াছিল ; ঠাকুরদাদাকে দেখিবামাত্র আনন্দে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, তাহার পিতাকে কোন দিকে দেখিতে পাইল না ; সে ভয়ে-ভয়ে ঠাকুরদাদার কাছে আসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, আমাকে একবার কোলে নেও না ; তুমি আমার পুজোর কাপড় এনেছ ?"

ঠাকুরদাদা মাণিককে কোলে লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন ; কিন্তু পাছে হারাণ দেখিতে পাইয়া মাণিককে প্রহার করে এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, "কাল তোমাকে জুতো কাপড় দেব, দাদা !"

সপ্তমীর দিন মুকুন্দ মাণিকের জন্য জুতা, একটা সাটিনের জামা ও একখানি ভাল ধুতি কিনিয়া আনিলেন। গৃহিণী তাহা দেখিয়াই তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার মত নিঘিন্নে বেটা ছেলে দুনিয়ায় আর নেই ! ওরা হলো পর, 'শত্তুর', ওদের ছেলেকে পুজোয় জুতো জামা কাপড় দেওয়া কেন ? পয়সা রাখবার বুঝি জায়গা পাচ্ছ না ? কথায়-কথায় ওরা অপমান করে, তবু মাণিক মাণিক করে খুন ! মাণিক যেন 'স্বগ্‌গে' বাতি দেবে !"

মুকুন্দ বলিলেন, "গিন্নি, সংসার একদিকে, আর মাণিক একদিকে। এই পুজোর দিনে মাণিককে একখানা কাপড় না দিয়ে আমি কি করে থাক্‌বো ? মাণিককে আমি যে দিন পর মনে করবো, সে দিন সংসার ছেড়ে বনে যাব !"

মুক্তকেশী বলিলেন, "সে দিন কেন, আজই—এখনই যাও ; তা হ'লে আমার হাড় জুড়োয় !"

সন্ধ্যার পর হারাণ গ্রামের "বীণাপাণি থিয়েটারের" মজলিসে আড্ডা দিতে গেল। সেই অবসরে মুকুন্দ মাণিককে জুতা জামা কাপড় পরাইয়া, তাহাকে কোলে লইয়া গাঙ্গুলী-বাড়ী ঠাকুর দেখিতে চলিলেন। মাণিক আরতি দেখিয়া বাড়ী আসিয়াও সেই জামা কাপড় ছাড়িল না, সেই পোশাক পরিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল।

[৭]

মহাষ্টমীর দিন অতি প্রত্যূষে মুকুন্দ তাঁহার ঘরের পাশে 'বেড়ার' মধ্যে বসিয়া বেগুনের চারাগুলি নিড়াইয়া দিতেছিলেন, এমন সময় মাণিক ঠাকুরদাদা প্রদত্ত জুতা জামায় সজ্জিত হইয়া, মহাউল্লাসে বাহিরে আসিল, এবং সেফালিকা বৃক্ষমূলে বসিয়া শিশিরসিক্ত সেফালিকাগুলি কুড়াইতে লাগিল।

হারাণ প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া 'দাঁতন' করিতে-করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মাণ্কে, জুতো জামা কোথায় গেলি রে ?"

ভয়ে মাণিকের প্রাণ উড়িয়া গেল ! সে কাতরভাবে বলিল, "ঠাকুর-দাদা দিয়েছে ।"

হারাণ সরোষে বলিল, "কেন তুই এ জুতো জামা নিতে গেলি ? আমি যা বারণ করে দিয়েছি, ফের তাই করেছিস্, লক্ষ্মীছাড়া পাজী !" হারাণ দাঁতন ফেলিয়া বীরদর্পে মাণিকেব কাছে গিয়া সজোরে তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল, এবং জুতা জামা কাপড় কাড়িয়া লইয়া ঝির হাত দিয়া তাহা মুকুন্দের স্ত্রীর নকট ফেরত পাঠাইল । মাণিক সেফালিকা বৃক্ষমূলে পড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল ।

বেড়ার ভিতব বসিয়া মুকুন্দ তাহা দেখিলেন, বেদনায় তাহার হৃদয় টন্-টন্ কবিয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল ; হাতের 'নিড়ানী' মাটিতে ফেলিয়া তিনি দুই হাত মাথায় দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "হা ভগবান্ !"—শিশুর কাতর আর্ত্তনাদে তাঁহাব হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল । মধ্যাহ্নে আহারে বসিয়া মাণিকের অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ তাঁহার মনে পড়িল ; তিনি ভাল করিয়া আহার কবিতে পাবিলেন না ।

দশমী আসিল । আজ বিজয়া দশমী ; সায়ংকালে গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদী জলে দুর্গা-প্রতিমার বিসর্জ্জনের পর গৃহে-গৃহে প্রণাম আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদের ধূম পড়িয়া গেল । আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশিগণ পবস্পরকে মিষ্ট মুখ করাইতে লাগিলেন ।

প্রতিমা বিসর্জ্জনের পব হাবাণচন্দ্র বাড়ী আসিয়া জননীকে প্রণাম করিল , তাহার পব প্রতিবেশিগৃহে গমনে উদ্যত হইযাছে, এমন সময় মাণিক বলিল, "বাবা, ঠাকুরদাদাকে প্রণাম করে আস্‌বো ?"

হারাণ ধমক দিয়া বলিল, "তুই ওদের ঘরে যাস্ তো তোর কান ছিঁড়ে দেব , হতভাগাকে এক কথা একশ দিন বল্‌তে হয় !"

শিশু দূবে দাঁড়াইয়া কাতর দৃষ্টিতে ঠাকুরদাদার ঘরেব দিকে চাহিয়া রহিল । সে দেখিল, পাড়াব বালক-বালিকাগণ নূতন ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া হাসিমুখে তাহাব ঠাকুবদাদার ঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে, তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিতেছে, লাড়ু সন্দেশ খাইতেছে ; আব সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, ঠাকুরদাদার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না ? সে পিতার প্রহার ও তিরস্কারের কথা ভুলিয়া গেল ; অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন দেখিল নিকটে কেহ নাই, তখন সে ডাকিল, "ঠাকুরদাদা, তোমাকে 'দণ্ডবাৎ' করতে যাব ?"

ঠাকুরদাদা সস্নেহে ডাকিলেন, "আয় !"

এই নির্বোধ বালক ও কুটবুদ্ধি বৃদ্ধ উভয়ের মধ্যে কে অধিক নির্লজ্জ কে বলিবে ?

হঠাৎ পিতার নিষেধাজ্ঞা মাণিকের মনে পড়িল ; সে বলিল, "না, যাব না ; বাবা মারবে।"—শিশু হইলেও সে জানিত ঘরের পাশের তিন কাঠা জমি লইয়াই ঠাকুরদাদার সহিত তাহাব পিতার বিরোধ।—মাণিক কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, ঐ জমিটুকু বাবাকে ছেড়ে দেও না কেন, তা হ'লে আমি তোমার কোলে উঠতে পাবো।"

শিশুকণ্ঠোচ্চারিত এই কথা কয়টি মুকুন্দচন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাঁহার মনে পড়িল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর যতদিন জীবিত ছিলেন—ততদিন তিনি পরম স্নেহ-যত্নে পরিবাববর্গকে প্রতিপালন করিয়াছেন ; এই ঘর বাড়ী জমি-জমা সমস্তই তিনি দাদার অনুগ্রহে লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ সহোদর সকলের প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই বড় ভাই এখন স্বর্গে গিয়াছেন, তিনি এক টুক্‌রা জমি লইয়া তাঁহার পুত্রের সহিত কলহে প্রবৃত্ত ! আজ বিজয়া দশমীব দিন পবম শত্রুও শত্রুতা ভুলিয়া হাসিমুখে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে ; আব তিনি শরিকী-বিবাদে মাতিয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন, স্নেহমমতা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এ পৃথিবীতে জীবন কয়দিনের জন্য ? কেশ পক্ক হইয়াছে, দাঁত পড়িযাছে, দেহের চর্ম্ম শিথিল ও চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে , মৃত্যুর তামসী-বিভাবরী অদূরে সমাগত প্রায় ; জীবনের এই সন্ধ্যাকালেও এত লোভ, এত আসক্তি ! তুচ্ছ এক টুক্‌রা জমির জন্য পুত্রতুল্য পরম স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের হৃদয়ে আঘাত করিতেছেন, অথচ আর দুই দিন পরে যেখানকার জমি সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে, সংসাবের কোনও আকর্ষণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না।—বৃদ্ধের হৃদয়ে অনুতাপের আগুন মুহূর্ত্তে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন ; বিজয়া দশমীর মিলনানন্দ তাঁহার নিকট বিদ্রূপের কশাঘাত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

[৮]

অনেক রাত্রে হারাণ বাড়ী ফিরিলে মুকুন্দ অপরাধীর ন্যায় হাবাণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পিতৃব্যকে গৃহদ্বারে দেখিয়া হারাণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। তাঁহার মনে হইল আজ বিজয়া

দশমী, বিবাদ-বিসম্বাদের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ সর্ব্বপ্রথমে পিতৃতুল্য পূজ্য বৃদ্ধ পিতৃব্যকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে যাওয়াই তাহার উচিত ছিল। এমন দিনেও কি গৃহবিবাদের কথা মনে করিতে আছে ? হারাণ কি বলিবে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া নত মস্তকে কাকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মুকুন্দ বলিলেন, "হারাণ, আজ বিজয়া দশমী, আমাদের হিন্দুর নিকট এমন শুভ দিন আর নাই ; আজ তুমি আমাকে প্রণাম করিতে যাও নাই কেন ? আমি কি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম ? আমি তোমাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছি ; ছেলেবেলায় তুমি তোমার বাবাকে চিনিতে না, আমাকেই চিনিতে। এখন আমি বুড়া হইয়াছি, তুমিও ছেলের বাপ হইয়াছ ; স্বার্থের মোহে জড়িত হইয়া এখন আমাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি সেই কাকাই আছি—তুমি আমার সেই ভাইপোই আছ। আমি যদি কঠোর ব্যবহারে তোমার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, তবে সে কথা কি এমন আনন্দের দিনে তোমার মনে করিয়া রাখা উচিত ? আমি মরিলে তোমাকে 'কাচা' পরিতে হইবে, তোমার সঙ্গে আমার এই রকম সম্বন্ধ। আমি তোমার মনের কষ্ট দূর করিব, যে তিন কাঠা জমি লইয়া আমার সঙ্গে তোমার বিবাদ—আজ আমি সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিব। আমার বেড়ের চাবি তুমি লও, আজ হইতে উহা তোমার। এখন আমার জলে এক পা, ডাঙ্গায় এক পা ; আমার এই শেষ জীবনের ভুলচুক তুমি ক্ষমা কর। তুমি আমাদের বংশের প্রদীপ ; আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া তোমার বাপের সুনাম রক্ষা কর।"

বৃদ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন, তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। হারাণের যে চক্ষু হইতে একদিন ক্রোধ ও প্রতিহিংসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছিল, আজ সেই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে পিতৃব্যচরণে প্রণত হইয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল. গদগদ স্বরে বলিল, "কাকা, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

আজ মাণিক এত রাত্রেও ঘুমায় নাই, গৃহদ্বারে ঠাকুরদাদার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে শয্যা ত্যাগ করিয়া মহা উৎসাহে বাহিরে আসিল, আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিল, "ঠাকুরদাদা, এই যে তুমি আমাদের ঘরে এসেছ !—বাবা, ঠাকুরদাদার কোলে যাই ?"

হারাণ বলিল, "যা।"

বালক হাসিতে-হাসিতে ঠাকুরদাদার কোলে লাফাইয়া উঠিল, দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চল. দিদিমাকে 'দণ্ডবাৎ' কববো।"

মুকুন্দ সস্নেহে মাণিকের মুখচুম্বন করিলেন ; অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইতে লাগিল, এবং তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের দীর্ঘকালসঞ্চিত বিষাদ ও বেদনা ধৌত হইয়া গেল।

দশমীর চন্দ্র শরতের মেঘনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল আকাশে বসিয়া কৌতুকভরে বালক ও বৃদ্ধের এই মধুর মিলন দর্শনে হাসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার শুভ্র হাস্য দুর্ব্বাদলসঞ্চিত শিশিরবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝক্-মক্ করিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ